আমার দেখা পৃথিবী-৬

রাতের সূর্য

[কানাডা, আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ইয়েমেন, মালয়েশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের বিস্ময়কর সফরনামা]

মূল

শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, দাঈ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়ীতা

ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমী, জেদ্দা, সৌদী আরব

শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

ইমাম ও খতীব : আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা

মুহাদ্দিস, টঙ্গি দারুল উলূম মাদরাসা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

অর্থ ঃ তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর, অতঃপর দেখ যে, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। (নাহল ঃ ৩৬)

বর্তমান যুগের পর্যটকদের মতো কেবলমাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যে আল্লাহওয়ালা কোন বুযুর্গ পৃথিবী ভ্রমণ করেননি। বরং তারা ইলমে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান, দ্বীনের প্রচার–প্রসার ও জিহাদের জন্য পৃথিবীতে সফর করে উপরোক্ত আয়াতের উপর আমল করার প্রয়াস পেয়েছেন।

ঐ একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ আলেম শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ইসলামী সেমিনার, সভা ও মাহফিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক দেশের অসংখ্য শহরে উপস্থিত হয়ে পথহারা মানুষকে দিয়েছেন পথের দিশা। এই নব্য জাহেলী যুগ—সৃষ্ট অনেক জটিল সমস্যার ইসলামী সমাধান পেশ করে মানবতাকে সিরাতে মুস্তাকীমের রাহনুমায়ী করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন—

"বিগত প্রায় বিশ বছর যাবত আমি ঠিকানাবিহীন পত্রের ন্যায় সফর করে চলছি। এ সকল সফরে অসংখ্য দেশ ও শহরের মাটি পায়ে লাগিয়েছি। তন্মধ্যে যে সকল সফরে উল্লেখযোগ্য জ্ঞানার্জন হয়েছে অথবা এ সুবাদে ইসলামী ইতিহাসের হারানো কোন অধ্যায় উল্টিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে, তার বিবরণ 'সফরনামা' রূপে লিপিবদ্ধ করেছি। যার প্রথম খণ্ড বিশটি দেশের সফরনামা "جهان دیده" নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং আমার

ধারণাতীত পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। এরপরও আমার সফরের ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং এখনো সফরেই আছি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পরও আমার অনেক দেশ সফর করা হয়েছে সেগুলোর বিবরণও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বন্ধুদের দাবী হলো جہان دیدہ –এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হোক।

বর্তমানে আপনাদের হাতে যে কিতাব دنیا میرے آگے তা মূলতঃ বন্ধুদের সে দাবীরই বাস্তবায়ন। দু'আ করি আল্লাহ পাক এই কিতাবকে পাঠকদের জন্য উপকারী বানান। আমীন।"

হযরতের বর্তমান সফরনামাটিও বিশটি দেশের সফরের কাহিনী সমন্বয়ে রচিত। বর্তমান সফরনামাটি পূর্বোক্ত সফরনামার চেয়েও আকর্ষণীয়। কারণ এ গ্রন্থে উত্তরমেরু সহ বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দেশের সফরকাহিনী এবং সেখানের বিরল, বিচিত্র ও বিস্ময়কর অবস্থা ও ঘটনার বিবরণ এসেছে যা পাঠ করে পাঠকমাত্রই পুলকিত ও বিস্মিত হয়ে আল্লাহ পাকের অপূর্ব কুদরতের স্বীকৃতি স্বরূপ বলে উঠবেন 'সুবহানাল্লাহ'। আমরা আমাদের পাঠকদের সুবিধার কথা চিন্তা করে এই কিতাবটিকেও দুই খণ্ডে প্রকাশ করছি। 'রাতের সূর্য' নামক বর্তমান খণ্ডে কানাডা, আমেরিকা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যাণ্ড, ইয়ামেন, মালয়েশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের সফরনামা বিবৃত হয়েছে।

আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত ও সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। এ ধরনের ত্রুটি যদি কারো দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে তা আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দিবো ইনশাআল্লাহ।

বইটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে দু'জনের শুকরিয়া আদায় করছি যাদের অবদান কোনভাবেই প্রতিদানযোগ্য নয়। তাদের একজন হলেন আমার শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী জনাব ইঞ্জিনিয়ার আসাদুজ্জামান ছাহেব আর অপরজন হলেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব আমানত ছাহেব। আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনের জন্য তাদেরকে কবুল করুন, আমীন।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

বিনীত—

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

১৭ই জিলকদ ১৪২৬হিজরী

২০শে ডিসেম্বর ২০০৫ ঈসায়ী

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মেহেরবানীতে ইতিপূর্বে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব (দা.বা.)এর ভ্রমণ কাহিনী সম্বলিত প্রথম গ্রন্থ 'জাহানে দিদাহ' তরজমা করার তাওফীক লাভ করি। আলহামদুলিল্লাহ, সে তরজমা খুব অল্প সময়ে পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে এবং সব মহলে ধারণাতীত সমাদৃত হয়। অনেকেই এজন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং দু'আ দেন। উৎসাহ যোগান। তাদের দু'আ ও উৎসাহকে সম্বল করে পরবর্তীতে আরো কয়েকটি বই তরজমা করার তাওফীক লাভ হয়। সেই ধারাবাহিকতায় আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এবার হযরত শাইখুল ইসলাম (দা.বা.)এর ভ্রমণ কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ড 'দুনিয়া মেরে আগে'-এর তরজমার শেষাংশ 'রাতের সূর্য' নামে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ!

বিদগ্ধ লেখক এ সমস্ত ভ্রমণকালে তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দ্বারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উন্নতি ও প্রাচুর্যের জোয়ার যেমন অবলোকন করেন, তেমনি আখেরাত বিস্মৃতি ও বল্গাহীন বিষয়-আসক্তির ফলে তাদের বিরামহীন অস্থির জীবন, অবাধ যৌনাচারের কষাঘাতে বিধ্বস্ত মানবতার কংকালসার চেহারা, অশান্ত হৃদয়ের আর্তচিৎকার এবং এ সব থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য তার ব্যাকুলতা ও দিবালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন এবং এর প্রতিকার স্বরূপ তিনি উম্মতের একজন একনিষ্ঠ 'মুসলিহ' হিসাবে ইসলাম প্রদত্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক সঞ্জীবনী সুধা ঐ সমস্ত পিপাসার্ত মানবতার সামনে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, মতবিনিময় আসর, ঘরোয়া আলোচনা ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে উদারভাবে পরিবেশন করেন, তুলে ধরেন তাদের সামনে সুস্থ ও সুখময় জীবনের সঠিক দিক নির্দেশনা।

লেখক ভ্রমণ কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে সে সব বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে সে সমস্ত দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নৈসর্গিক বিবরণ এবং ভ্রমণকালীন তাঁর বিচিত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা—যেমন, সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ, সাগরের তলদেশ ও উত্তর মেরু ভ্রমণ, উত্তরে পৃথিবীর সর্বশেষ স্থলভাগে আযান দিয়ে দুপুর রাতে সূর্য সামনে নিয়ে নামায আদায় করা ইত্যাদি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং শিকড় সন্ধানী ঐতিহাসিকের ন্যায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের মণিমুক্তা দ্বারা তাঁর এ ভ্রমণ কাহিনীকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

ভ্রমণে আনন্দ আছে, শিক্ষা আছে। হযরতের ভ্রমণ কাহিনীতে আনন্দ ও শিক্ষা যুগপৎভাবে চিত্রিত হয়েছে। ফলে পাঠক লিখনীর বাহনে সওয়ার হয়ে ভ্রমণে তাঁর সহযাত্রী হয়ে একই সঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দের সরোবরে অবগাহন করে। পুলক অনুভব করে। শিক্ষা লাভ করে। এ বই পাঠে একজন মর্দে মুমিনের 'বাসিরাত' ও 'ফেরাসাত'-এর নজরে পৃথিবীর বসন্তের মাঝে হেমন্তের সম্যক উপস্থিতি পাঠক নিজেও উপলব্ধি করে। নশ্বর পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখের অন্তরালে স্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান সুস্পষ্ট শুনতে পায়।

একটি বই প্রকাশ হয়ে পাঠকের হাত পর্যন্ত পৌঁছতে জানা-অজানা বহু লোকের দু'আ ও সহযোগিতা কার্যকর থাকে। এ বইয়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। আমি তাদের সকলের শুকরিয়া আদায় করছি। বইয়ে ব্যবহৃত স্থান ও ব্যক্তিসমূহের নাম উর্দূ থেকে সঠিক উচ্চারণসহ নেওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান সাহেব সেগুলো যথাসম্ভব ঠিক করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সর্বোপরি মনোরম প্রচ্ছদ ও আকর্ষণীয় অঙ্গসজ্জায় বইটি প্রকাশ করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আদর্শ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ-এর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব (দা.বা.)এর। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আফিয়াতের সাথে নেক আমলের দীর্ঘ জীবন, উম্মতে মুসলিমার অধিকতর খেদমত করার তাওফীক এবং ইহ-পরকালীন সুখ-শান্তি, সফলতা ও তাঁর রেযামন্দি নসীব করুন। আমীন।

সঠিক ও সুন্দরভাবে অনুবাদ করার আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আমার দুর্বলতার কারণে ভুল থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুহৃদ পাঠক ভুলগুলো অবহিত করলে দু'আ দিব এবং পরবর্তীতে সংশোধন করে নিব, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা মূল বইয়ের মত অনুবাদটিকেও কবুল করুন। তাঁর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম এবং নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
বেজগাঁতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ
৬ই জিলকদ, ১৪২৬ হিজরী

লেখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى اله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين-امابعد-

বিগত প্রায় বিশ বছর যাবত আমি একটি বৃন্তচ্যুত পত্রের ন্যায় বিরামহীনভাবে সফর করে চলছি। সেই সুবাদে আমি কত দেশ আর কত নগরী যে চষে বেড়িয়েছি তার হিসেব নেই। তার মধ্যকার বিভিন্ন সফরের উল্লেখযোগ্য তথ্য–বৃত্তান্ত এবং তদসংশ্লিষ্ট ইসলামের হারানো ইতিহাস–ঐতিহ্যের নানা অধ্যায় আমি 'সফরনামা' রূপে লিখে আসছি। যার প্রথমাংশ 'জাহানে দীদাহ' [১] নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আশাতীত সমাদৃত হয়েছে। 'জাহানে দীদাহ' ছেপে বের হওয়ার পরও অব্যাহত গতিতে আমার সফর চলতে থাকে এবং এখনও তা' অব্যাহত রয়েছে। এখন এই ভূমিকা লেখার সময়েও আমি দীর্ঘ এক সফরের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে আছি। সুতরাং ইতোমধ্যে আরো কিছু 'সফরনামা' লেখা সম্পন্ন হয়েছে। হিতাকাংখী বন্ধুমহলের পক্ষ থেকে 'জাহানে দীদাহ'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করার জন্যও তাড়া আসতে থাকে। বক্ষমান গ্রন্থ তাদের সেই বাসনারই প্রতিফলন। তবে বিভিন্ন কারণে আমি একে 'জাহানে দীদাহ'র দ্বিতীয় খণ্ড না বানিয়ে এর নাম দেই 'দুনিয়া মেরে আগে'।

পাঠককে উভয় পুস্তক একত্রে ক্রয় করতে বা পাঠ করতে বাধ্য না করা এই নাম পরিবর্তন করার অন্যতম কারণ। আর এটিও একটি কারণ যে, আমার প্রথম পুস্তকের নামের সঠিক উচ্চারণ হলো 'জাহানে দীদাহ' [جهان ديده যের বিশিষ্ট নূন দিয়ে] কিন্তু অনেক পাঠকই এত

---

১. 'জাহানে দীদাহ' আমরা বাংলায় ৪ খণ্ডে প্রকাশ করেছি—১ম খণ্ড ফুরাত নদীর তীরে। ২য় খণ্ড উহুদ থেকে কাসিয়ূন। ৩য় খণ্ড হারানো ঐতিহ্যের দেশে। ৪র্থ খণ্ড অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক। বাংলা অনুবাদ আশাতীত সমাদৃত হয়েছে। —প্রকাশক

অধিকহারে এর উচ্চারণ 'জাহাঁ দীদাহ' [جہاں دیدہ নূনে গুন্না সহযোগে] করেছে যে, আমি এই দ্বিতীয় পুস্তকের সঙ্গে এমন অবিচার করার আর দুঃসাহস করি না। আমার সম্মুখে মানুষ যতবার এই পুস্তকের নাম 'জাহাঁ দীদাহ' [جہاں دیدہ নূনে গুন্না সহযোগে] উচ্চারণ করে, ততবারই আমার অন্তরে গ্লানি অনুভব করি। বিধায় দ্বিতীয় পুস্তকের নাম পরিবর্তন করার মধ্যেই নিরাপত্তা দেখতে পাই।

যাই হোক, পুস্তকটি এখন আপনাদের সামনে। আল্লাহ তাআলা পুস্তকটিকে পাঠককুলের মনোরঞ্জনের উপকরণ এবং কল্যাণকর করেন, এটিই আমার আন্তরিক দু'আ।

মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী–১৪
৫ই রবিউস সানী, ১৪২৩ হিজরী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
'বুলগার'–পরিচিতি	১৩৯
ওসলোতে অবস্থান	১৪৩
ট্রমসোতে	১৪৪
উত্তরমেরুর জাদুঘর	১৫০
নর্থ কেইপের সমুদ্র ভ্রমণ	১৫৪
হোনিন্সভোগে 'মূল ছায়া'	১৫৬
নর্থকেইপ	১৫৯
এ সমস্ত স্থানে নামাযের বিধান	১৬০
ওসলোতে প্রত্যাবর্তন	১৬৫
সুইডেন	১৬৮
ফিনল্যাণ্ড ভ্রমণ	১৭১
সার্বিক প্রতিক্রিয়া	১৭৬
জার্মানী ও ইটালীর একটি সফর	১৮৩
ইটালীর সফর	১৯০
ভ্যাটিক্যানে	১৯১
রোমের ধ্বংসাবশেষ	১৯৫
ভেনিসে	১৯৭

অষ্ট্রেলিয়ায় কয়েক দিন

পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা এই চারটি মহাদেশের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য দেশসমূহে আমার প্রায়ই যাওয়ার সুযোগ হয়ে থাকে। তবে পঞ্চম মহাদেশ অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়ায় ইতিপূর্বে আমার কখনো যাওয়া হয়নি। কয়েক বারই সেখানকার বন্ধুগণ সেখানে যাওয়ার জন্য দাওয়াত করেন। কিন্তু আমার ব্যস্ততার কারণে চূড়ান্ত কোন প্রোগ্রাম হয়ে ওঠেনি। গত বছর অক্টোবরে গোল্ডকোষ্টের মাওলানা আসাদুল্লাহ তারেক সাহেব করাচী তাশরীফ আনেন। তিনি খুব গুরুত্ব সহকারে অষ্ট্রেলিয়া আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আমি আমার সময়সূচীকে সামনে রেখে জানাই যে, ১৪১১ হিজরীর জুমাদাস সানিয়া মাসে (এপ্রিল, ২০০০) আমার জন্য সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে। কারণ, তখন মাদরাসায় ত্রৈমাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সে সময় আমি ইনশাআল্লাহ একসপ্তাহ বা দশদিন অষ্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণের জন্য বের করতে পারব।

মাওলানার প্রচেষ্টায় কুইন্সল্যাণ্ডের একটি ইসলামী সোসাইটি আমাকে নিমন্ত্রণ করে। ফলে ২৫শে এপ্রিল ২০০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫ই মে ২০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করি। এ সফরের অনেক কিছু পাঠক সমাজের উপকার ও মনোরঞ্জনের কারণ হবে বলে আমি আশা করি বিধায় এর সামান্য কিছু বিবরণ এখানে তুলে ধরছি।

সফরের বৃত্তান্তে যাওয়ার পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং সেখানে মুসলমানদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের উপর একবার নজর বুলানো সমীচীন হবে।

অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ মহাদেশ। মহাদেশটি ভারত সাগর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিকদের বক্তব্য,

এখানকার শীলাসমূহের বয়স অনুপাতে এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাদেশ, যা সবার শেষে আবিস্কৃত হয়। সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ এই যে, বৃটিশ নেভীর ক্যাপ্টেন জেমস কুক সর্বপ্রথম ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া আবিস্কার করেন। তবে কথাটি এতটুকু পর্যন্ত সঠিক যে, একটি সভ্য দেশ হিসেবে অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাস জেমস কুকের নৌভ্রমণের ফলে সূচিত হয়। তবে ইতিপূর্বেও এ মহাদেশে অনেক লোকের পৌছার সাক্ষী বিদ্যমান রয়েছে। আর এ কথা তো খুবই স্পষ্ট যে, যখন বৃটিশ অধিবাস গ্রহণকারীরা অষ্ট্রেলিয়ায় পৌছে, তখন সেখানে একটি জাতি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল, যারা শত শত বছর ধরে সেখানে বসবাস করে আসছিল। তাদেরকে এবোরজিনিস (Aborginies) বলা হয়। এরা যদিও অসভ্য গোত্রীয় লোকরূপে এখানে বসবাস করছিল, তবুও তাদের সংখ্যা সেসময় কমপক্ষে তিন লক্ষ ছিল। তাদের দেহের গঠন ও অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এরা ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভ্রমণ করে এখানে এসে পৌছে। যখন বৃটেনের লোকেরা অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস আরম্ভ করে, তখন প্রথম দিকে Aborginies-রা তাদেরকে সুস্বাগত জানায়। কিন্তু যখন বৃটিশ অধিবাসীরা নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাদের বস্তিসমূহ উজাড় করতে আরম্ভ করে, তখন তারা এতে বাধা প্রদান করে। তখন বৃটিশ আগন্তুকরা নির্দয়ভাবে তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করে। হাজার হাজার স্থানীয় অধিবাসী এই গণহত্যার শিকার হয়। কিছুদিন তারা বৃটিশ অধিবাস গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালু রাখে। কিন্তু পরবর্তীতে বৃটিশ শক্তির সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করে তাদের পরিকল্পনায় একাকার হওয়া ছাড়া এদের আর কোন উপায় থাকে না।[১]

হাজার হাজার লোক নিহত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বহুসংখ্যক লোকের এখনও সেখানে আবাদ রয়েছে। কিন্তু সাধারণতঃ এরা বড় বড় শহর থেকে দূরে মফস্বল এলাকায় বাস করে। তাদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম। এখানকার লোকেরা বলে যে, তাদের বসবাসের এলাকাসমূহে

১. বিস্তারিত জানার জন্য ইনসাইক্লোপেডিয়া, ব্রিটানিকা, পৃঃ ৪২৮, ভলিউম ১৪, প্রকাশকাল ১৯৮৮ খৃঃ, পঞ্চদশ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

মাদকদ্রব্য খুব সস্তা করে দেওয়া হয়েছে। তারা মদের নেশায় বুদ হয়ে থাকে। তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্ত। মজার ব্যাপার হল, যদিও এ সকল লোক অষ্ট্রেলিয়ার মূল অধিবাসী কিন্তু এদেরকেই Aborginies (অর্থাৎ তারা এখানকার মূল অধিবাসী নয়) বলা হয়। অষ্ট্রেলিয়ার জাঁকজমকপূর্ণ শহরসমূহের সঙ্গে তাদের বস্তির তুলনা করা হলে তাদেরকে অস্পৃশ্যের ন্যায় মনে হয়।

অষ্ট্রেলিয়া খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী একটি দেশ। সেখানে সোনা ও পেট্রোল থেকে নিয়ে ইউরেনিয়ামসহ সব কিছুর খনি রয়েছে। এ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকার ফলে আজ সিডনী, মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, পার্থ ও ক্যানবেরার ন্যায় বড় বড় শহর স্বীয় রূপ–সৌন্দর্য ও বৈষয়িক উন্নতিতে আমেরিকা ও ইউরোপকে ম্লান করছে। কিন্তু একথা খুব কম মানুষেরই জানা রয়েছে যে, এখানকার খনিজ সম্পদ উত্তোলনে পাকিস্তানী মুসলমানগণের বিরাট অবদান রয়েছে। বর্তমানের অষ্ট্রেলিয়া যেই অর্থনৈতিক উন্নতিতে সমুজ্জ্বল, তাতে করাচী থেকে খায়বার পর্যন্তের হাজার হাজার মুসলমানের রক্ত ও পানি মিশে আছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় মুসলমান

এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যখন বৃটিশ বণিকরা অষ্ট্রেলিয়া আবিস্কার করে, তখন প্রথম প্রথম এ দ্বীপকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, যে উদ্দেশ্যে একসময় কালাপানিকে ব্যবহার করা হত। অর্থাৎ বৃটিশ আইনের অধীনে যে সমস্ত অপরাধী দেশান্তরের দণ্ডপ্রাপ্ত হত, তাদেরকে এখানে পাঠিয়ে দেয়া হত। ক্রমে ক্রমে দেশান্তরিত সেই লোকদের বংশধর এখানে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। পরবর্তীতে বহু বৃটিশ অধিবাসী এ উপমহাদেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যও এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করতে থাকে। যখন বৃটিশ অভিবাসীদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেল এবং তারা এ অঞ্চলের সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যতকে জড়িয়ে ফেলল, তখন তাদের সামনে সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলকে পরস্পরে সংযুক্ত করা এবং মহাদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে খনি আবিস্কার করার জন্য সড়ক নির্মাণের প্রয়োজন দেখা

দেয়। কিন্তু সমস্যা এই দেখা দেয় যে, মহাদেশটির মধ্যবর্তী এলাকাসমূহের অনেকটাই ছিল বৃক্ষলতাশূন্য মরুভূমি। বৃটিশ অভিবাসীদের মরু এলাকায় কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল না। তারা ঘোড়ায় চড়ে এ সমস্ত এলাকায় কাজ করার চেষ্টা চালায়, কিন্তু ঘোড়া এ মরু এলাকায় কাজ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। তারা বুঝতে পারে যে, এ মরুভূমিতে যাতায়াত ও মাল আনা নেওয়ার জন্য উট ছাড়া অন্য কোন জিনিস কার্যকর হতে পারে না। অষ্ট্রেলিয়ায় উট ছিল দুষ্প্রাপ্য। তাই নাবিকরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উট ক্রয় করে জাহাজে করে অষ্ট্রেলিয়া পৌছানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের যেহেতু উট ব্যবহার করার এবং সেগুলোকে সামলানোর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না তাই কয়েকবারই এমন হয় যে, বেশীর ভাগ উট অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে পৌছার পূর্বেই পথের মাঝে মারা যায়। এক দু'টি উট জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় এসে পৌছালেও অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে কাজে ব্যবহৃত হওয়ার পূর্বেই সেগুলো রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়ে।

এ পর্যায়ে বৃটিশ অধিবাসীরা বুঝতে পারে যে, উট দ্বারা সঠিকভাবে কাজ নিতে হলে উটের সাথে তার রাখালদেরকেও আনা জরুরী। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে কিছু অষ্ট্রেলিয়ান বণিক করাচীর বন্দরনগরীতে অবতরণ করে। তারা সিন্ধু, মাকরান, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের উটের মালিকদের সাথে চুক্তি করে যে, তারা নিজেদের উট নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া যাবে এবং সেখানকার মরুভূমি অতিক্রম করার কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করবে। এই চুক্তির অধীনে উপরোক্ত প্রদেশসমূহের উটের মালিকদের বড় বড় খেপ করাচীর বন্দর থেকে বিভিন্ন সময়ে শত শত উট নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া পৌছায়।

তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হয়। এ সমস্ত উটের মালিক মরুভূমিতে কাজ করার পদ্ধতি জানত। তারা ছিল খুবই শক্তিশালী ও কষ্টসহিষ্ণু। তারা স্বল্পমাত্র বিনিময়ে অষ্ট্রেলিয়ায় সেই কাজ করতে আরম্ভ করে, যা বহু বছর ব্যয় করেও অসম্ভব মেনে হচ্ছিল। তাদেরই পরিশ্রম ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার ফলে অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমির মধ্য দিয়ে সড়ক নির্মিত হয়, খনি আবিস্কৃত হয় এবং সুচারুরূপে খনি থেকে মাল আনা নেয়ার

কাজ সম্পাদিত হয়। অষ্ট্রেলিয়া এ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা লাভবান হতে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে এ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের জোরে সমগ্র মহাদেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এ সমস্ত উটের মালিক—যারা অষ্ট্রেলিয়ায় এ জটিল কর্ম সম্পাদন করে—যদিও তাদের বেশীর ভাগ সিন্ধু, মাকরান, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের লোক ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যকার বিরাট সংখ্যক লোক ছিল আফগান বংশোদ্ভূত। তাই অষ্ট্রেলিয়াতে তাদেরকে 'আফগান' বলা হত। পরবর্তীতে এই নামকে সংক্ষিপ্ত করে তাদেরকে ঘান (Ghan) বলা হত। এরা ছিল মুসলমান। এরা সেখানে নিজেদের জনবসতি গড়ে তোলে। যেগুলোকে এখানে Ghan town অর্থাৎ 'আফগান জনপদ' বলা হয়।

সেই 'আফগান' উটের মালিকদের প্রথম সফল কাফেলা করাচী বন্দর থেকে জাহাজে আরোহণ করে ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া পৌছে। সে কাফেলায় ১২৪টি উট এবং আরো কিছু পশু ছিল। সেগুলোর তত্ত্বাবধানের জন্য ৩১জন আফগানকে অষ্ট্রেলিয়ায় আনা হয়েছিল। এঁরা ছিলেন পাকা মুসলমান। এঁরা নিজেদের বৃটিশ অফিসারদের পক্ষ থেকে চরম নিরাশাব্যাঞ্জক আচরণ করা এবং কঠিন অবস্থা বিরাজ করা সত্ত্বেও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথমবার ছাপড়া মসজিদ তৈরী করেন। ধীরে ধীরে কিছু মসজিদে টিনের ছাউনী দেয়া হয়। এজন্য সেগুলোকে Tin Mosque–ও বলা হয়। তারা নিজেদের জনপদের নামও নিজ নিজ কবিলার নাম হিসাবে রাখে। যেমন 'মিরী' কবিলার লোকেরা নিজেদের বসতি এলাকার নাম রাখে 'মিরী' এবং তাদের নির্মিত মসজিদও 'মিরী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। মরুভূমিতে কাজের অগ্রগতির সাথে সাথে আরো আফগানকে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তান থেকে আনা হয়। এমনকি অষ্ট্রেলিয়ায় তারা বহু সংখ্যায় বসতি স্থাপন করে। শহর এলাকার সর্বপ্রথম মসজিদ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি এডেলেইড (Adelaide) শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মসজিদ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পার্থে নির্মাণ করা হয়। [১]

অষ্ট্রেলিয়ার বিনির্মাণ ও উন্নতিতে এ সমস্ত উট মালিকদের মুখ্য

1. The Oxford Campanion to Australian History, page 353, Oxford, 1998

ভূমিকা থাকলেও তাদের সঙ্গে বৃটিশ অভিবাসীদের আচরণ প্রথম থেকেই ভাল ছিল না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ যখন সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে যায় এবং খনিসমূহ আবিস্কৃত হয়ে যায়, তখন উটের প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়, এমতাবস্থায় সেই আফগানদের জন্য অন্য রোজগারের সুযোগ বিলুপ্ত করে তাদেরকে অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করতে দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। তাদের অনেকে দেশে ফিরে আসে। আর যারা রয়ে যায়, তারা বড় অসহায় অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে। এখন অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাস থেকে তাদের অবদানকে প্রায় বিস্মৃত করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার একজন গবেষক ক্রিষ্টিন ষ্টিভেন্স (Christine Stevens) ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত পরিশ্রম করে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থটির নাম Tin Mosque And Ghantowns অর্থাৎ 'টিন মসজিদ ও আফগান জনবসতি।' ৩৭২ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই বড় বইটিতে তিনি সেই উটের মালিকদের ইতিহাস অনেক অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সংকলন করেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি লেখেন ঃ

> 'আফগান ও তাদের পশুরা এমন এক সময়ে অষ্ট্রেলিয়ার হৃদয় পর্যন্ত পৌছা সম্ভব করে দিয়েছে, যখন এ কাজ করতে অন্য লোকেরা বেশীর ভাগই ব্যর্থ হয়। এতদসত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে ভীতি ও ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়। তাদের একক সমাজকে পৃথক করে দেওয়া হয়। তাদের মন ও প্রকৃতি এবং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে খুব কমই বোঝার চেষ্টা করা হয়। বরং আজ পর্যন্ত সাধারণত তাদের বিরুদ্ধে অনেক ভুল বুঝাবুঝি পাওয়া যায়।' (পৃঃ ১)

এই আফগানদের পর জার্মান, তুরস্ক, লেবানন, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত ও পাকিস্তান থেকে বহু সংখ্যক মুসলমান এখানে এসে অধিবাস গ্রহণ করে। ১৯৯১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী মতে এখানে ৬৭টি দেশ থেকে আগত মুসলমানগণ অধিবাস গ্রহণ করেছে। সেই সরকারী আদমশুমারী অনুপাতে মুসলমানদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫ শত ৭ ছিল।

(The Oxford Companion to Australion History, p. 3563)

বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যা ২ কোটি। বেসরকারী অনুমান অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ৫ লাখের কাছাকাছি বলা হয়। অষ্ট্রেলিয়া

এদিক থেকে একটি ব্যতিক্রমধর্মী মহাদেশ যে, সমগ্র মহাদেশটি একটি মাত্র দেশসমন্বিত। যার সরকারী নাম 'কমনওয়েলথ অব অষ্ট্রেলিয়া'। এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত এবং যা ছয়টি রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত। ছয়টি রাজ্য হল, নিউ সাউথ ওয়েলস, রাজধানী সিডনী। ভিক্টোরিয়া, যার প্রধান কেন্দ্র মেলবোর্ন। কুইন্সল্যাণ্ড, যার কেন্দ্র ব্রিসবেন। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, যার রাজধানী এ্যাডেলেইড। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া, যার প্রধান কেন্দ্র পার্থ এবং তাসমানিয়া, যা একদম দক্ষিণের একটি উত্তপ্ত দ্বীপ। এর প্রধান কেন্দ্র হোবার্ট। সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা। এটি সিডনী থেকে দক্ষিণে অবস্থিত। ইসলামাবাদের সঙ্গে এটি অনেক সাদৃশ্যপূর্ণ।

মুসলমানদের সর্বাধিক অধিবাস নিউ সাউথ ওয়েলসে, দ্বিতীয় নাম্বারে ভিক্টোরিয়া। তৃতীয় নাম্বারে কুইন্সল্যাণ্ডে, আর সম্ভবতঃ চতুর্থ নাম্বারে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায়।

আমার সাম্প্রতিককালের সফরে কুইন্সল্যাণ্ডের শহর ব্রিসবেন ও গোল্ডকোষ্ট, ভিক্টোরিয়ার শহর মেলবোর্ন, নিউসাউথ ওয়েলসের শহর সিডনী ও সেন্ট্রাল কোষ্ট ভ্রমণ করার সুযোগ হয়। এ রাজ্যগুলো সে দেশের মুসলমানদের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র।

ভ্রমণ শুরু

২০০০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিলের মঙ্গলবার দিনটি অতিবাহিত হওয়ার পর রাতের তিনটার দিকে অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে আমার দীর্ঘ ভ্রমণ আরম্ভ হয়। থাই এয়্যারওয়েজের বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ৫ ঘন্টা ওড়ার পর যখন থাইল্যাণ্ডের স্থানীয় সময় সকাল ৯টার কাছাকাছি ব্যাংককের বিমানবন্দরে অবতরণ করি, তখন সারারাতের অনিদ্রা এবং তার পূর্বের দিনের চরম ক্লান্তির কারণে আমার শরীর চূর্ণ–বিচূর্ণ মনে হচ্ছিল। আমাকে আট ঘন্টা সময় ব্যাংককে অতিবাহিত করে বিকাল ৫টায় পুনরায় অষ্ট্রেলিয়ার বিমানে আরোহণ করতে হবে। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার আমি ব্যাংককে এসেছি। কি এক অজানা কারণে এখানে দিন কাটানো আমার কাছে সবসময় বোঝা মনে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ

তাআলার শোকর যে, বিরতির এ আটঘন্টা অতিবাহিত করার জন্য এয়ারওয়েজের পক্ষ থেকে বিমানবন্দরের সীমানার মধ্যে অবস্থিত হোটেল আমারিতে একটি কক্ষ বুক করে দেওয়া হয়েছিল। তাই আমাকে শহরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে হয় নাই। বিমান থেকে নেমে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হোটেল কক্ষে পৌঁছে যাই। ব্যাংককের পাকিস্তানী দূতাবাসের প্রোটোকল অফিসার মি. শেখ ছাড়া অন্য কেউ আমার ব্যাংককে আসা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি আমাকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে যান। এতে করে এমন নিরিবিলিতে আমি আরাম করার সুযোগ পাই, যা এখন জীবনে কদাচিতই হাতে আসে। দুই আড়াই ঘন্টার মজার ঘুম হল, আর লেখাপড়ার যে কাজ আমার সাথে থাকে, তা এমন নির্বিঘ্নে সমাধান করার সুযোগ হল যে, এ সময়ের মধ্যে কোন সাক্ষাতপ্রার্থীও বিঘ্ন ঘটায়নি এবং কোন টেলিফোনও আসেনি। এমন মানসিক একাগ্রতা কয়েক ঘন্টার জন্যও হাতে পেলে তা আমার নিকট বড় নেয়ামত মনে হয়। সুতরাং এ কয়টি ঘন্টা অতি আরামে অতিবাহিত হয় এবং বিকাল নাগাদ আল্লাহর মেহেরবানীতে দীর্ঘ সফর করার জন্য আমি পরিপূর্ণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠি।

বিকাল পাঁচটায় বৃটিশ এয়ারওয়েজের বিমান সিডনীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এটি ছিল ৯ ঘন্টার আকাশ পথের ভ্রমণ। মাআরিফুল কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ আমার সাথে ছিল। আমি তা পুনরায় সংশোধন করছিলাম। ইংরেজী মাআরিফুল কুরআনের সংশোধনীর বেশীর ভাগ কাজ আমি বিমানে ভ্রমণরত অবস্থায়ই করি। এখন আল্লাহর মেহেরবানীতে চার ভলিউম শেষ হওয়ার পর পঞ্চম ভলিউমের সংশোধনীর কাজ চলছে। আলহামদুলিল্লাহ এই ভ্রমণ চলাকালে সূরা ইউসুফ ও সূরা র'আদ শেষ হয়ে যায়। বিমান সারারাত ভারত সাগর ও তার বিভিন্ন দ্বীপের উপর দিয়ে উড়তে থাকে। চরম ক্লান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করার পূর্ব পর্যন্ত আমি কাজ করতে থাকি। তারপর শেষ দু' তিন ঘন্টায় বিমান যখন অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙলে দেখি, উদয়াচল থেকে সুবহে সাদিক উদয় হচ্ছে। আমি নামায শেষ করার অবিলম্ব পর বিমান অবতরণ করতে আরম্ভ করে। নীচে সুবহে সাদিকের

ঊর্ধ্বমুখী আলোয় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে সুদূর বিস্তৃত সিডনী শহরের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে বিমান সিডনীর সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত বিমান বন্দরে অবতরণ করে। আমার গন্তব্য আরো সম্মুখে। আমাকে এখান থেকে অপর একটি বিমানে আরোহণ করে ব্রিসবেন (Brisbane) শহরে যেতে হবে। সেখানকার বিমান ছিল মাত্র এক ঘন্টা পর। এই সময়ের মধ্যে আমাকে ইমিগ্রেশন, মালপত্র বুঝে নেওয়া ও কাষ্টমের কাজ শেষ করে অন্য টার্মিনাল থেকে স্থানীয় বিমান ধরতে হবে। বিমানবন্দরে সিডনীতে নিয়োজিত পাকিস্তানের কাউন্সিল জেনারেল মিঃ বাকের রেজা স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি সময়ের স্বল্পতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তাই তিনি পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যেন ইমিগ্রেশন ও কাষ্টমে দেরী না হয়। কিন্তু মালপত্র আসতে সময় লেগে যায়। আমরা আভ্যন্তরীণ বিমানের কাউন্টারে পৌছে জানতে পারি যে, এখন আর সেই বিমান পর্যন্ত পৌছা সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে তার মাত্র আধা ঘন্টা পরই দ্বিতীয় বিমান পেয়ে যাই। বিমানবন্দরের বাইরে ড. মাওলানা শাব্বির সাহেব (তিনি মাশাআল্লাহ অষ্ট্রেলিয়ায় ধর্মীয় কর্মসম্পাদনে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব) কিছু বন্ধুসহ প্রতীক্ষমান ছিলেন। তিনি ব্রিসবেনে আমার মেজবানদেরকে বিমান পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করেন। বিমানবন্দরেই কিছু সময় তাদের সঙ্গে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। ইতিমধ্যে বিমানের সময় হয়ে যায়।

ব্রিসবেনে

এখান থেকে ব্রিসবেন এক ঘন্টার পথ। ব্রিসবেন অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যের প্রধান শহর। এ শহরেরই ইসলামিক সোসাইটি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। এখানে আমাকে চারদিন অতিবাহিত করতে হবে। ব্রিসবেন একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তো বটেই তাছাড়া পর্যটকদের মনোরঞ্জনের যথেষ্ট উপাদান থাকার কারণে এখানে এশিয়া ও আমেরিকা থেকে সরাসরি বিমানও এসে থাকে। আমি বিমান থেকে বের হয়ে দেখি বন্ধুদের বড় একটি দল স্বাগত জানানোর জন্য প্রতীক্ষারত

রয়েছেন। তাদের মধ্যে গোল্ডকোষ্টের ইসলামী সেন্টারের প্রধান মাওলানা আসাদুল্লাহ তারেক, ব্রিসবেনের মাওলানা মুহাম্মাদ উযায়ের এবং ব্রিসবেনের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরিবার আলহাজ হাবীব দ্বীনের নাম এখন স্মরণ রয়েছে। ব্রিসবেন অষ্ট্রেলিয়ার সুন্দরতম নগরীসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা তাকে অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করেছেন। শহরটি অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর–পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। ছোট ছোট সবুজ–শ্যামল পাহাড় ও হৃদয়গ্রাহী উপত্যকাসমূহ শহরটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। অষ্ট্রেলিয়ায় এ সময় শীত আসি আসি করছিল। তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আবহাওয়ার মৃদু শৈত্য এখানকার দৃশ্যাবলীকেও অধিক উন্মাদনাকর বানিয়েছিল। শহর–সংলগ্ন সুদৃশ্য একটি আবাসিক এলাকার নাম 'হল্যাণ্ড পার্ক।' এখানকার একটি সবুজ টিলার চূড়ায় বড় সুদৃশ্য একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদটি এ অঞ্চলের মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। এ মসজিদের সম্মুখের ছোট সুদৃশ্য একটি বাড়ীতে আমি অবস্থান করি। বাড়ীটি মূলতঃ মাওলানা উযায়ের সাহেবের, কিন্তু আমার অবস্থানকালে তা বিশেষভাবে আমার ও আমার সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

মাওলানা উযায়ের সাহেব একজন আলোকদীপ্ত আলেম। তিনি বৃটেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানে ধর্মীয় শিক্ষালাভ করেন। হল্যাণ্ড পার্কের মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্রে তিনি প্রশংসনীয় খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। ইংরেজী ভাষা ও ভাবভঙ্গিতে তিনি পরিপূর্ণ পারঙ্গম। তিনি মুসলমান তরুণদেরকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে মাশাআল্লাহ পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন। তাঁর সৌরভপূর্ণ স্বভাব তরুণদেরকে নিজের সঙ্গে অকৃত্রিম বানিয়ে তাদেরকে খুবই ঘনিস্ঠ করে রেখেছে। আমার অষ্ট্রেলিয়া অবস্থানকালে বিরামহীনভাবে তিনি আমার সঙ্গে থাকেন। তিনি পরিপূর্ণরূপে আতিথ্যের হক পুরো করেন ও মেজবানীর দায়িত্ব পালন করেন।

সেই বাড়ীতে পৌছতে পৌছতে দশটা বেজে গিয়েছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। হালকা হালকা বৃষ্টি শয়নকক্ষের জানালার ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান সবুজ–শ্যামল পর্বতসারির দৃশ্যকে অধিকতর রূপময় করে

তুলেছিল। দীর্ঘ সফরের পর দু'তিন ঘন্টার শান্তিপূর্ণ নিদ্রা মন–মেযাজে নব উদ্যম সৃষ্টি করে। যোহর থেকে আসর পর্যন্তও কোন ব্যস্ততা ছিল না। তবে আসরের পর থেকে সাক্ষাতপ্রার্থীদের আগমন আরম্ভ হয়। মাগরিব নামাযের পর নিমন্ত্রণকারীগণ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে নৈশভোজের আয়োজন করেন। বন্ধু–বান্ধবগণ দূরদূরান্ত থেকে বড় মহব্বত নিয়ে সাক্ষাত করতে আসেন।

নৈশভোজের পর এখান থেকে কিছুটা দূরে অপর একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ করবীতে এশার নামায আদায় করার প্রোগ্রাম ছিল। নামাযের পর আমার ভাষণের ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা এশার সময় সেখানে পৌছে দেখি মসজিদের চোহদ্দীর পুরোটা এবং তার আশেপাশের জায়গাসমূহ গাড়ী দ্বারা পরিপূর্ণ। মানুষ শত শত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য এসেছে। এমনকি নামাযের জন্য মসজিদে জায়গার সংকুলান হয় না। অনেকেই বাইরে নামায আদায় করেন। মসজিদের ইমাম সাহেব বললেন ঃ এ মসজিদে ইতিপূর্বে কখনো এত বড় সমাবেশ দেখা যায়নি। অষ্ট্রেলিয়ায় যেহেতু বিভিন্ন জাতির মুসলমানের বসবাস রয়েছে, যাদের মধ্যে উপমহাদেশ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের আরব মুসলমান, সোমালিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিজি, আইল্যাণ্ড, তুরস্ক ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাই এমন সম্মিলিত ভাষা, যা সবাই বুঝতে পারে ইংরেজী ছাড়া অন্য কোনটি ছিল না। সুতরাং আমার মেজবান আমাকে পূর্বেই বলেছিলেন যে, এখানকার সমস্ত বক্তব্য ইংরেজীতে হওয়া জরুরী।

অপরদিকে বিভিন্ন দেশের এ সমস্ত মুসলমানের মাযহাবও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে এদের মনে এ প্রশ্নটি বড় খটকা সৃষ্টি করে থাকে যে, ফেকাহ সংক্রান্ত মাযহাবসমূহের মধ্যে মতবিরোধের কারণ কী? এ ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থা কোন্‌টি? ইতিপূর্বে কিছু লোক এ ধরনের কথা বলে এ বিষয়ে অধিক মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করেছে যে, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এ সমস্ত মাযহাব বেদআত ও শেরেকী। তাই এগুলোর কোন একটিকে মেনে চলা গোমরাহী। যার ফলে এই ভিনদেশে মুসলমানগণ যে সমস্ত

মৌলিক সমস্যার মুখোমুখী, সেগুলোর সমাধানের পরিবর্তে শাখা বিষয়ক মতবিরোধ মুসলমানদের মধ্যে একতার পরিবর্তে দূরত্ব সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে।

অবস্থার এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমার মেজবানগণ আমার আজকের ভাষণের শিরোনাম দিয়েছিলেন 'ইসলামী ফেকাহ ও ফেকাহ বিষয়ক মাযহাবসমূহের স্বরূপ।' যেন ফেকাহ বিষয়ক মাযহাবের স্বরূপ পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে লোকদেরকে একতা ও ঐকমত্যের আহবান জানানো যায়। বিষয়টি ছিল জ্ঞানগত ও সবিস্তারে আলোচনা করার মত। এক বৈঠকে তা বর্ণনা করা কঠিন দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীকে এ বিষয়বস্তুর উপর প্রায় দেড় ঘন্টা সময় সবিস্তারে বক্তব্য দান করি। আমি সংক্ষেপে কুরআন কর্তৃক বর্ণিত ফেকাহ সংক্রান্ত মূলনীতিসমূহের উপর আলোকপাত করে নিবেদন করি যে, দ্বীনের অধিকাংশ মৌলিক বিষয়, যেমন তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাস, ইসলামের রুকনসমূহ ; মিথ্যা, গীবত, জুলুম, ব্যভিচার, প্রতারণা, সুদ, জুয়া, মদপান ইত্যাদি হারাম হওয়া এমন সব বিষয়, যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত বিধান সুস্পষ্ট। এসব ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে কখনও কোন মতবিরোধ হয়নি। সুতরাং এসব ব্যাপারে পৃথক কোন মাযহাবের কোন প্রয়োজনও নেই এবং এসব ব্যাপারে কোন মাযহাব হয়ওনি। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহের বহু শাখা মাসআলা এমন রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তাঁর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে কিছুটা সংক্ষেপ করেছেন। যে কারণে সেগুলোর একাধিক ব্যাখ্যার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সে সমস্ত ব্যাখ্যার মধ্য থেকে কোন একটি ব্যাখ্যাকে নির্ধারণ করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপক ও গভীর ইলমের প্রয়োজন রয়েছে। পবিত্র কুরআন নিজেই

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

আয়াত দ্বারা এ মূলনীতি ব্যক্ত করেছে যে, এমন বিস্তর ও গভীর ইলম অর্জন করা সবার জন্য সম্ভবও নয় এবং জরুরীও নয়। এর পরিবর্তে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ এই যে, কিছু লোক এমন উচ্চতর ইলম অর্জনের জন্য নিজেকে ওয়াকফ করবে। তারপর সেই ইলমের

ফলাফল অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। সুতরাং এ মূলনীতির উপর আমল করতে গিয়ে এ উম্মতের ফকীহগণ নিজেদের জীবনকে এ কাজের জন্য ওয়াকফ করে দেন এবং এ সমস্ত বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালান। এ প্রচেষ্টারই নাম 'ইজতিহাদ'।

অপরদিকে যেহেতু এ সমস্ত বিধানের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক ব্যাখ্যা (Interpretations) সম্ভব রয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষের বিচারশক্তি একরকম সৃষ্টি করেননি, এজন্য সহজাত ভাবেই এঁদের ইজতিহাদ ও গবেষণার ফলাফলে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন ফেকাহ–বিষয়ক মাযহাব অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু যেহেতু তাঁদের প্রত্যেকে পূর্ণ সাধুতা, একনিষ্ঠতা ও অধ্যবসায় সহকারে কুরআন ও সুন্নাহের সঠিক উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন, তাই তাঁদের কাউকেই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বা বাতিল বলা যাবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো, খন্দকের যুদ্ধের পর যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বনী কুরাইযার ইহুদীদের উপর আক্রমণ করার হুকুম করা হয় তখন তিনি কতিপয় সাহাবীকে বনী কুরাইযার এলাকা অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁদেরকে তাকীদ করে বলেন যে, আসরের নামায সেখানেই গিয়ে পড়বে। সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা করেন। কিন্তু পথের মধ্যেই আসর নামাযের সময় হয়ে যায়। তখন কতিপয় সাহাবীর মত হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আসরের নামায গন্তব্যস্থলে পৌছে পড়ার জন্য তাকীদ করেছেন, তাই সেখানে গিয়েই নামায পড়তে হবে। সুতরাং তাঁরা পথে নামায পড়লেন না। কিন্তু অন্যান্যদের মত ছিল এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আসল উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যেন সেখানে তাড়াতাড়ি পৌছি। তাঁর কথার উদ্দেশ্য এ ছিল না যে, কোন কারণে পথিমধ্যে আসর নামাযের সময় হয়ে গেলেও পথে আসর নামায পড়া জায়েয হবে না। সুতরাং তাঁরা পথেই আসর নামায পড়লেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় দলের সাহাবাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হলেন। কিন্তু তিনি কোন দলকেই তিরস্কার করলেন না। এ থেকে পরিস্কার প্রতিভাত হয় যে, যে সমস্ত মাসআলার ব্যাপারে ইজতিহাদ করার অবকাশ রয়েছে, সেগুলোর কোন

এক অবস্থানকে একশ'র মধ্যে একশ' ভাগ সঠিক এবং অপরটিকে একশ'র মধ্যে একশ' ভাগ অঠিক বলা যাবে না। তবে শর্ত হল, যিনি ইজতিহাদ করবেন, তাকে বিস্তর ও গভীর ইলমের সে সমস্ত শর্ত পুরো করতে হবে, যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে 'আহকামের ইস্তিম্বাত' অর্থাৎ বিধান উদ্ভাবন ও নির্ণয়ের জন্য জরুরী। এবং শুধুমাত্র এ কারণে তার এ মত গ্রহণ না করতে হবে যে, তা তার প্রবৃত্তির অধিক অনুকূল বা তা অধিক সহজ। বরং কুরআন ও সুন্নাহেরই প্রমাণসমূহের ভিত্তিতে যে মত তার নিকট অধিক শক্তিশালী দৃষ্টিগোচর হবে, নিষ্ঠার সাথে তা গ্রহণ করতে হবে।

হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব এভাবেই অস্তিত্ব লাভ করে। এগুলোর কোনটিকেই গলদ বা বাতিল বলা যাবে না। এগুলোর মধ্যের বিরোধ হক ও বাতিলের বিরোধ নয়, বরং উত্তম ও অনুত্তমের বিরোধ। এখন যে ব্যক্তি না আরবী জানে, না কুরআন ও হাদীসের ইলম সম্পর্কে যথার্থ অবগত, তার জন্য সে যে মুজতাহিদ ইমামকে বড় আলেম মনে করবে, তাঁর মতের উপর আস্থা পোষণ করে সে অনুপাতে আমল করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এটি মূলতঃ সেই মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ নয়, বরং কুরআন ও সুন্নাহরই অনুসরণ। তবে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে তার সাহায্য নেওয়া হয়েছে মাত্র। তাই মূল উদ্দেশ্য যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করা, নিজের প্রবৃত্তির উপর নয়, তাই এটি মোটেও জায়েয নেই যে, যে মাসআলার ব্যাপারে যে ইমামের মাযহাব নিজের প্রবৃত্তির অনুকূলে মনে হবে, সে অনুপাতে আমল করবে। কারণ, কোন ইমামই তাঁর মাযহাবকে এ ভিত্তিতে খাড়া করেননি যে, তা তাঁর প্রবৃত্তির অনুকূল বা অধিক সহজ। বরং দলীল প্রমাণের ভিত্তিতেই তাঁরা এটি নির্ধারণ করেছেন। তাই নিরাপদ পন্থা এটিই যে, মানুষ যে ইমামকে অধিক বড় আলেম মনে করবে বা যাঁর থেকে সমাধান লাভ করা সহজ হবে, তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের উপর আস্থা পোষণ করে সে অনুপাতে কুরআন ও সুন্নাহের শাখা মাসআলাসমূহের উপর আমল করবে। হাঁ, কোন ব্যক্তি যদি এত ব্যাপক ও গভীর ইলমের অধিকারী হয় যে, সে তার নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে

বিভিন্ন মাসআলার মধ্যে ফায়সালা করতে পারে, তাহলে সে যে মাযহাবকে দলিলের ভিত্তিতে অধিক মজবুত মনে করবে, তা গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু তা সবার কাজ নয়। আমি একথাও নিবেদন করি যে, এদেশে মুসলমানগণ বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রিক সমস্যার সম্মুখীন। যেগুলোর সমাধানের জন্য সবাইকে একপ্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে। এ সমস্ত শাখা বিষয়ের বিরোধকে উত্তপ্ত না করে এ মূলনীতির উপর কাজ করতে হবে যে, 'নিজের মাযহাবকে ছেড়ো না এবং অন্যের মাযহাবকে ছিঁড়ো না'। এছাড়া মুসলমানদের বিভিন্ন দলের লোকদের মধ্যে একতা বজায় রাখার অন্য কোন পথ নেই। এ ভীনদেশেও যদি ঐ সমস্ত মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতাকে আমদানী করা হয়, যা আমাদের পাপের ফলে মুসলমান দেশসমূহে পাওয়া যায়, তাহলে এখানে মুসলমানদের ভবিষ্যত রক্ষার কোন পথ থাকবে না।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর আলহামদুলিল্লাহ সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। বক্তব্য শেষে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রশ্নোত্তরের ধারাও চলতে থাকে। আল্লাহর মেহেরবানীতে সমাবেশে অংশগ্রহণকারীগণ খোলামনে স্বীকার করেন যে, এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা তাদের অন্তর থেকে সন্দেহ-সংশয়মূলক বহু খটকাই বিদূরিত হয়েছে।

দু' আড়াই ঘন্টার দীর্ঘ এ মানসিক পরিশ্রমের পর যখন অবস্থান কেন্দ্রে ফিরে যাওয়ার সময় আসে, তখন আমাদের মেজবান জনাব আলহাজ হাবীব দ্বীন সাহেব কিছু সময় বিনোদন করার এবং ব্রিসবেন শহর ঘুরে দেখার প্রস্তাব করেন। জনাব হাবীব দ্বীন সাহেবের পরিবার অষ্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ পরিবার। তাঁরা 'দ্বীন ব্রাদার্স' নামে পরিচিত। তাঁদের পূর্ব পুরুষ মূলতঃ মাদ্রাজে থাকতেন। তাঁরা অষ্ট্রেলিয়ায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। এখানে তাঁরা বিভিন্ন ব্যবসায় সুনাম অর্জন করেন। হাবীব দ্বীন সাহেবের মূল কাজ ঠিকাদারী। একাজে তাঁর নাম গ্রীনিজ বুক অব রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যে, তিনি মাত্র ৫০ সেকেণ্ড সময়ে বড় একটি ভবনকে বিধ্বস্ত করে ভূমির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুনিয়ার সাথে সাথে দ্বীনের উদ্দীপনাও দান করেছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসা

ও স্কুল প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিরাট অংশ রয়েছে। তিনি গাড়ী চালিয়ে ব্রিসবেনের প্রধান এলাকাসমূহ ঘুরে দেখান। ব্রিসবেন এমনিতেও খুব সুন্দর শহর। যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে নগরায়নিক সৌন্দর্যও যুক্ত হয়েছে। তবে রাতের বেলা তার দৃশ্য ছিল সত্যিই দেখার মত। প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট ছোট শাখা নদীরূপে শহরের ভিতরে ঢুকে পড়েছে, যার উভয় তীরে আকাশচুম্বী উজ্জ্বল ভবনসমূহ দাঁড়িয়ে আছে। উভয় তীরকে যুক্ত করার জন্য কিছুদূর পর পর সেতু নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেক সেতুর ডিজাইন ভিন্ন রকম, যা পরিবেশকে দ্বিগুণ সুন্দর করেছে।

শহরটি এক চক্কর ঘুরে দেখার পর হাবীব দ্বীন সাহেব আমাদেরকে একটি পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যান। চূড়াটিকে মাউন্ট গ্রাফেট (Mount Graffet) বলে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, যখন মুসলমানগণ অষ্ট্রেলিয়ায় আসেন, তখন তারা অনেক স্থানের নাম আরবী ঐতিহ্য মতে রেখেছিলেন। এই পাহাড়ের নামও তারা 'আরাফা' রেখেছিলেন। এ নামকে বিকৃত করে ইংরেজীতে গ্রাফেট বানানো হয়। এর সত্যাসত্য আল্লাহ ভাল জানেন। এই পাহাড়ের চূড়া থেকে সম্পূর্ণ শহয়টি দেখা যাচ্ছিল। জমিনের বিস্তৃত আলোসমূহ জমিনকে নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের রূপ দান করেছিল।

পরদিন (২৮শে এপ্রিল) জুমাবার ছিল। অষ্ট্রেলিয়ায় উপমহাদেশের অধিবাসীগণ বিভিন্ন স্থানে তাদের কমিউনিটির জন্য প্রাইভেট রেডিও ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা করেছে। সেগুলোর সম্প্রচারিত প্রোগ্রামসমূহ খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা হয়। তার একটি রেডিও ষ্টেশন এক ঘন্টা সময় ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত প্রোগ্রামও সম্প্রচার করে। সেই প্রোগ্রামের অর্থসংস্থানও দ্বীন পরিবার করে থাকে। ইসলামী শিক্ষার এই উর্দূ প্রোগ্রাম ভোর ছয়টায় সম্প্রচারিত হয়। পূর্ব থেকে জুমুআর দিন সকালে এই রেডিও ষ্টেশন থেকে আমার ভাষণ ও সাক্ষাতকার ঘোষণা করা হয়ে আসছিল যে, সম্প্রচারিত হবে। সুতরাং ফজরের পর অবিলম্বে সেই রেডিও ষ্টেশনে যাই। সেখানে প্রায় আধাঘন্টা সময় উর্দূতে আমার ভাষণ সম্প্রচারিত হয়। যা ছিল এই সফরকালের আমার একমাত্র উর্দূ ভাষণ। পরে ১৫ মিনিটের একটি সাক্ষাতকারও সম্প্রচার করা হয়। আমার সন্দেহ

ছিল যে, এত ভোরে মানুষ কি রেডিও শুনবে? কিন্তু পরবর্তীতে সাক্ষাতকারীগণ রেডিওর এই ভাষণের উদ্ধৃতি দেয়, তাতে অনুমিত হয় যে, এ প্রোগ্রাম ব্যাপক সমাদৃত।

আমাকে আজকের জুমুআর নামায হল্যাণ্ড পার্কের মসজিদে পড়াতে হবে। এসব দেশে যেহেতু জুমুআর দিন ছুটি নেই তাই এখানে নামাযের পূর্বের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, যেন মানুষ দ্রুত নিজের কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারে। সুতরাং নামাযের পূর্বে ২০ মিনিটের মত আমার আলোচনা হয়। মসজিদের উভয় তলা জনাকীর্ণ ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমানদের দুধে চিনিতে একাকার হয়ে নামায আদায় করা এবং তারপর আন্তরিক ভালবাসা নিয়ে পরস্পরে মিলিত হওয়া বড় ঈমানোদ্দীপক দৃশ্যের অবতারণা করে। যা কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়।

জুমুআর আলোচনা তো ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সেদিন রাতেই এশার পর হল্যাণ্ড পার্কের মসজিদেই আমার বিস্তারিত বক্তব্যের ঘোষণা করা হয়েছিল। সুতরাং এশার পর মুসলমানদের ব্যাপক ও সামগ্রিক সমস্যাদি সম্পর্কে প্রায় ১ ঘন্টা সময় আমার ভাষণ হয়। তারপর প্রায় ঐ পরিমাণ সময়ই প্রশ্নোত্তরের ধারা চলতে থাকে। আজকের সমাবেশ সম্পর্কেও স্থানীয় লোকদের প্রতিক্রিয়া ছিল যে, ইতিপূর্বে কখনো রাতের বেলা এত বড় সমাবেশ এ মসজিদে হয়নি। এমন লোকের সংখ্যাও অনেক ছিল, যারা একশ' কিলোমিটারেরও অধিক পথ অতিক্রম করে এসেছিল। তাদের মধ্যে সর্বস্তরের লোকই ছিল। তাদের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি থেকে তাদের এ তৃষ্ণা প্রকটভাবে ভাস্বর হয়ে উঠছিল যে, তারা দ্বীন সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য জানতে চায়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মুসলমানদেরকে নিজেদের দ্বীন অনুপাতে জীবন অতিবাহিত করতে বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তাদের ধর্মীয় চেতনা এত মজবুত যে, তারা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে নিজেদের ইসলামী স্বকীয়তাকে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের বয়োবৃদ্ধ লোকদের থেকেই শুধু নয়, বরং তরুণ যুবকদের থেকেও এমন এমন প্রশ্ন শোনা যায়, যা আমরা আমাদের দেশের তরুণদের থেকে শুনতে পাই না। এ থেকে পরিস্কার প্রতিভাত হয় যে, তারা হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয সম্পর্কে কত বেশী সচেতন। সমাবেশ চলাকালে সাধারণ প্রশ্নোত্তর পর্বের পরও অনেক লোক ব্যক্তিগতভাবে পৃথক সময় নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ চায়। তাদের মধ্যে অনেক লোক ছিলেন এমন, যারা আমার বইপুস্তক ও লেখনীর মাধ্যমে আমার সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। উপমহাদেশের মুসলমানদের নিকট আমার কিতাবসমূহ পৌছেছিল। আরব মুসলমানগণ আমার আরবী ও ইংরেজী গ্রন্থসমূহের মধ্যস্থতায় আমার সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এরা ছাড়া অনেকে এমনও ছিলেন, যারা এই প্রথমবার আমার সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু যে নিষ্ঠা, ভালবাসা ও হৃদ্যতার প্রদর্শন তারা করেন, তার চিত্র বিস্মৃত হওয়ার নয়।

শনিবার সকাল ৯টায় কুইন্সল্যাণ্ড ইউনিভার্সিটিতে আমার ভাষণ দানের প্রোগ্রাম ছিল। 'কুইন্সল্যাণ্ড' অষ্ট্রেলিয়ার একটি রাজ্য, আর এটি তার সর্ববৃহৎ ইউনিভার্সিটি। এখানে ১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাধীন রয়েছে। এখানকার মুসলমান ছাত্ররা ইউনিভার্সিটির হল কক্ষে আমার ভাষণ দানের আয়োজন করেছিলেন। ছাত্র ও ছাত্রীদের বসার জায়গা পর্দার সাথে পৃথক পৃথক রাখা হয়েছিল। এখানে আমি সবিস্তারে ভাষণ দান করি। তাতে আমি ইলমের স্বরূপ স্পষ্ট করে বর্ণনা করার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা জ্ঞান লাভ করার জন্য মানুষকে যে সমস্ত উপাদান ও উপকরণ দান করেছেন, সেগুলোর বিভিন্ন কর্মপরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করি। জ্ঞান সম্পর্কে ইসলামী ও অনৈসলামী চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরে মুসলমান ছাত্রদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করি। এ প্রোগ্রাম সম্পর্কে পূর্ব থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল বিধায় ছাত্ররা ছাড়া কিছু প্রফেসর ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণও শ্রোতা হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

গোল্ডকোষ্টে

ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রামের পর সেদিনই আমার গোল্ডকোষ্ট যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। এটি কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যের উপকূলীয় একটি শহর। যা ব্রিসবেন থেকে প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি পর্যটনের

বড় একটি কেন্দ্র। ব্রিসবেন হতে বের হয়ে আমাদের এখানে পৌছতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগে। মধ্যবর্তী পথটি সবুজ-শ্যামল প্রান্তর, উপকূলীয় এলাকা ও ছোট ছোট শহরের সমন্বয়ে সুসজ্জিত ছিল। যোহরের নামায আমরা গোল্ডকোষ্ট পৌছে আদায় করি। আল্লাহর মেহেরবানীতে এখানকার সুদর্শন একটি মসজিদ এ এলাকার মুসলমানদের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। মসজিদের হলকক্ষ অনেক বিস্তৃত। মসজিদের হলকক্ষের নীচে মুসলমানদের সাধারণ সমাবেশের জন্য অতি প্রশস্ত একটি হলকক্ষ রয়েছে। মসজিদের সাথে একটি লাইব্রেরী এবং মুসলমানদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একটি স্কুলও রয়েছে। এই ইসলামী সেন্টারের ধর্মীয় বিষয়সমূহের প্রধান দায়িত্বশীল মাওলানা আসাদ উল্লাহ তারেক সাহেব। মাশাআল্লাহ, তিনি সুবিস্তর ইলমের অধিকারী একজন আলেম। তিনি হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী সাহেব (রহঃ)এর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিননূরী টাউন থেকে 'তাখাসসুস ফিদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ' এর কোর্স সমাপন করে প্রথমে ফিজি আইল্যাণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডে কর্মরত থাকেন। এখন তিনি অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যে মুসলমানদের ধর্মীয় দিক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করছেন। ইংরেজীর উপর তাঁর পূর্ণ দক্ষতা রয়েছে। তাঁর বক্তৃতা এখানে খুব সমাদৃত। তিনি খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক লেখাপড়া করে অনেক খৃষ্টান নারী-পুরুষকে ইসলামে দীক্ষিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ ছাড়াও মুসলমানদের সামগ্রিক সমস্যাদিতে তাঁকে এলাকার মুসলিম অধিবাসীদের প্রতিনিধি মনে করা হয়। তিনি আল্লাহর মেহেরবানীতে বুদ্ধিমত্তার সাথে এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

একবার কিছু যুবককে কোন এক অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে একজন মুসলমান তরুণও ছিল। অবশিষ্টরা ছিল অমুসলিম। অমুসলিমদের উকিল সাম্প্রদায়িক মনোভাব গ্রহণ করে বলে যে, মূল অপরাধি মুসলমান যুবকটি। সে-ই অন্যান্য যুবকদেরকে এই অপরাধ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। সে তার দাবীর পক্ষে এই প্রমাণ খাড়া করে যে, মুসলমানরা জীবনের বিভিন্ন শাখায় কট্টরপন্থী হয়ে থাকে। জজ তার কথামত অমুসলিম তরুণদেরকে নির্দোষ ঘোষণা দিয়ে শুধুমাত্র মুসলমান ছেলেটিকে দণ্ডাদেশ দেয়। সে তার রায়ে লেখে যে, মুসলমানরা কট্টরপন্থী। এ সময় মাওলানা তারেক জজের এ অবিচারমূলক রিমার্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। পত্রপত্রিকায় তাঁর সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়। ব্যাপারটি অনেক দূর গড়ায়। অবশেষে জজকে সেই রিমার্কের কারণে স্পষ্ট ভাষায় ভুল স্বীকার করতে হয় এবং তাও পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পায়।

এখানে খৃষ্টান মিশনারী স্কুলের ছাত্রদেরকে মসজিদসমূহ পরিদর্শন করানোর প্রচলনও রয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মিশনারীর শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতামূলক অন্ধত্ব নির্ভর পুরাতন প্রশ্নসমূহ শিখিয়ে পাঠায়, যেগুলো খৃষ্টানরা বহুবছর ধরে ইসলাম সম্পর্কে প্রসিদ্ধ করে রেখেছে। যেমন, ইসলাম তরবারীর শক্তিতে বিস্তার লাভ করেছে। ইসলামে নারীদের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার এমনই এক পরিদর্শনকালে মাওলানা তারেক ছাত্রদের প্রশ্নের এমন প্রভাবশালী আঙ্গিকে উত্তর দেন যে, তাদের শিক্ষক দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেন যে, আমাদের বহু বছরের প্রতিক্রিয়ার বিপক্ষে আজ প্রথমবার এই স্বরূপ উন্মোচিত হয় যে, ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এসব আপত্তিসমূহ অবিচারমূলক ও নিছক প্রপাগাণ্ডার ফসল।

গোল্ডকোষ্ট পৌছার পর সেদিন সম্মিলিত কোন প্রোগ্রাম ছিল না। তবে দুপুর ও রাতের আহারের সময় এলাকার সম্মানিত লোকদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। এ অবস্থা দেখে খুবই আনন্দিত হই যে, এখানকার মুসলমানগণ—যারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত—দুধ ও চিনির ন্যায় একাত্ম হয়ে এই ইসলামী কেন্দ্রের মাধ্যমে মুসলমানদের খেদমতে লিপ্ত রয়েছেন।

আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়টি খালি ছিল। এ সময় আমরা ভ্রমণের জন্য উপকূলীয় এলাকার দিকে বের হই। গোল্ডকোষ্ট বিশ্বের সুন্দরতম উপকূলসমূহের অন্যতম। প্রশান্ত মহাসাগরের এই উপকূল ধরে সত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ সুদৃশ্য এক উপকূলীয় সড়ক চলে গেছে। সড়কটিতে সমুদ্রের তীরে বিভিন্ন বিনোদনকেন্দ্র বানানো হয়েছে।

সড়কের ধারে পর্যটকদের অবস্থানের জন্য কয়েক মাইল এলাকা পর্যন্ত হোটেল ও এপার্টমেন্টসমূহের দীর্ঘ এক সারি রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর পর্যটকগণ এখানকার উপকূলীয় সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য এসে থাকে। এখন শীতকাল বিধায় এ উপকূল সেই নোংরামী ও কুরুচিপূর্ণ কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত রয়েছে, যা সাধারণতঃ পাশ্চাত্য-প্রভাবান্বিত উপকূলসমূহকে একজন সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য অসহনীয় করে দেয়। সবুজ-শ্যামল পাহাড়, শ্যামলিয়ামময় ময়দান ও তাতে উৎপন্ন নানারঙের বৃক্ষসমূহের সম্মুখস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের নীলাভ তরঙ্গমালা আল্লাহর নিপুণ শিল্পের অবিস্মরণীয় দৃশ্য তুলে ধরছিল। বিরামহীন মানসিক পরিশ্রমের মধ্যবর্তী বিশ্রামের এ সময়টি বড়ই উদ্দীপনাকর হয় এবং তা পুনরুদ্যমে আমাকে প্রাণবন্ত করে।

পরদিন ছিল রবিবার। ১১টায় গোল্ডকোস্টের জামে' মসজিদে আমার ভাষণের এলান হয়েছিল। আজ ছিল ছুটির দিন, মানুষ এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য বহু দূর দূরান্ত হতে সমবেত হয়েছিল। কিছু মানুষ একশ' মাইলেরও অধিক পথ অতিক্রম করে এসেছিল। প্রায় সোয়া ঘন্টার ভাষণের পর যোহর নামায পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরের ধারা চলতে থাকে। যোহর নামাযের পর চলে ব্যক্তিগত সাক্ষাত। তাতে মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করে। এসবের সামগ্রিক ফল দ্বারা অনুমিত হয় যে, প্রত্যেক স্তরের মুসলমানগণ নিজেদের ইসলামী স্বকীয়তাকে সংরক্ষণ এবং দ্বীনী শিক্ষার আলোকে নিজেদের সমস্যার সমাধানের জন্য কত বেশী চিন্তাশীল।

আসরের পর আমরা ব্রিসবেন প্রত্যাবর্তনের জন্য রওয়ানা করি। সেখানে পৌঁছে মাগরিবের নামায আদায় করি। যদিও ব্রিসবেন শহরে বিশোর্ধ মসজিদ রয়েছে, কিন্তু এখন শহরের প্রাণকেন্দ্রের 'দারা' মহল্লায় একটি নতুন মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। এটি হবে শহরের সর্ববৃহৎ মসজিদ। এশার পর নিকটবর্তী একটি হলকক্ষে এই মসজিদ নির্মাণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে প্রভাবশালী লোকেরা আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করেন। এখানেও আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ হয়। এই মজলিসেই উপস্থিত লোকেরা ছাদ ঢালাইয়ের

জন্য চল্লিশ হাজার ডলার মসজিদের ফাণ্ডে চাঁদা দেয়।

অষ্ট্রেলিয়ার মুসলমানগণ এদিক থেকে অত্যন্ত সুসংহত যে, প্রত্যেক মসজিদের সাথে ইসলামী সোসাইটি নামে একটি করে সংগঠন রয়েছে। তারপর প্রত্যেক রাজ্যের সমস্ত ইসলামী সোসাইটির সমন্বয়ে প্রাদেশিক পর্যায়ে একটি ইসলামী কাউন্সিল কাজ করছে। এ সমস্ত প্রাদেশিক ইসলামী কাউন্সিলসমূহ সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি ফেডারেশন বানিয়েছে। তার নাম 'অষ্ট্রেলিয়ান ফেডারেশন অব ইসলামিক কাউন্সিলস' (AFIC)। এভাবে তৃণমূল পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান পরস্পরে সংযুক্ত ও সুসংহত। 'দারা' মসজিদের এ সমাবেশে AFIC-এর চেয়ারম্যান, কুইন্সল্যাণ্ড ইসলামী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং 'দারা' ইসলামিক সোস্যাইটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলে মসজিদ নির্মাণের এ কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মেলবোর্নে

এটি ছিল আমার ব্রিসবেনে অবস্থানের শেষ রাত। আগামী দিন সকাল সাড়ে আটটায় আমাকে মেলবোর্নের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। এ সফরে গোল্ডকোস্টের মাওলানা তারেক সাহেব ও হল্যাণ্ড পার্কের মাওলানা উযায়ের সাহেবও আমার সাথে ছিলেন। মেলবোর্ন ব্রিসবেন থেকে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এটি দক্ষিণ-পূর্বে এ মহাদেশের প্রায় শেষ প্রান্তে। মেলবোর্ন ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী। সিডনীর পর এটি অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। সিডনীর পর এ শহরেই সর্বাধিক মুসলমান অধিবাসী রয়েছে। এখানেও প্রায় চল্লিশটি মসজিদ রয়েছে। মুসলমানগণ নিজেদের সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য নিজেরা বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করেছেন। সম্প্রতি দু' বছর ধরে করাচীর মাদরাসা আয়েশার ব্যবস্থাপকগণ এখানে বড় একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিক্ষাকেন্দ্রটি দারুল উলূম কলেজ ফ্যাকনার নামে প্রসিদ্ধ। এর পৃষ্ঠপোষক এক হৃদয়বান আরব মুসলমান। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার তাবলীগ জামাতেরও প্রধান। দারুল উলূম করাচী থেকে

'তাখাচ্ছুছ' সমাপনকারী মাওলানা নাজীব সাহেব এ প্রতিষ্ঠানের সহকারী পরিচালক ও মুফতী পদে কাজ করছেন। দ্বিতীয় সহকারী পরিচালক মাওলানা মুস্তাফা সাহেব, তিনি তুরস্কের অধিবাসী। তিনিও আমাদের দারুল উলূমে শিক্ষা লাভ করেন। তৃতীয় সহকারী পরিচালক মাওলানা অসীম সাহেব, তিনিও তরুণ যুবক ও ভদ্র আলেম। এঁরা সবাই বিমান বন্দরে আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন।

বিমানবন্দর থেকে আমরা দারুল উলূম কলেজে যাই। এটি মেলবোর্নের ফ্যাকনার মহল্লায় অবস্থিত। তারই একটি বাড়ীতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দারুল উলূম কলেজটি মাত্র দেড় দু' বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে এখন প্রতিষ্ঠানটি বড় একটি ভবন লাভ করেছে। যা পূর্বেও একটি স্কুল ভবন ছিল। তাই ভবনটি ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পূরণে অধিক উপযুক্ত। এই ভবনেরই একটি হলকক্ষ অস্থায়ীভাবে নামাযের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তার বাইরে সুপ্রশস্ত একটি জায়গা খালি রয়েছে। সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে দারুল উলূম কলেজে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। নবম শ্রেণী পর্যন্ত সরকারী পাঠ্যক্রম পরিপূর্ণরূপে পড়ানোর সাথে সাথে ছাত্রদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায়ও শিক্ষিত করা হয়। ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে তাদেরকে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। তাদের ইউনিফর্ম থেকে নিয়ে রুটিন পর্যন্ত সববিষয়ে ধর্মীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। বর্তমানে কলেজে তিনশ' ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষারত রয়েছে। এ বছর থেকে ইসলামী শিক্ষাদানের জন্য 'দরসে নিযামীর' পাঠদানও আরম্ভ করা হয়েছে। শহরের মুসলমানগণ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নিজেদের সন্তানদেরকে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে থাকেন। সকাল বেলায় সন্তানদেরকে পৌছানো এবং বিকাল বেলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ীর লম্বা সারি লেগে থাকে। কোন কোন মাতা-পিতা দু' ঘন্টার পথ অতিক্রম করে সন্তানদেরকে এখানে নিয়ে আসেন। এতদসত্বেও অনেক ছাত্রের ভর্তির আবেদন এজন্য গ্রহণ করা যায়নি যে, বর্তমানে তিনশ'র অধিক ছাত্রের স্থান সংকুলান হয় না।

যোহর নামাযের পর কলেজ পরিদর্শন করানো হয়।

আলহামদুলিল্লাহ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থাপনা, শিক্ষা-দীক্ষার মান ও পরিবেশে মোটের উপর ধর্মীয় প্রভাব প্রত্যক্ষ করে মন বড় আনন্দিত হয়। মাশাআল্লাহ, কলেজের লাইব্রেরীও এখানকার হিসাবে বেশ সমৃদ্ধ ও মূল্যবান। এতে যথেষ্ট পরিমাণ আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষার মানসম্পন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের সংগ্রহ রয়েছে এবং এর সংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিদর্শনের পর এখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মুখে আমার ভাষণদানের ব্যবস্থা ছিল। কলেজের শিক্ষা-মাধ্যম ইংরেজী। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও বিভিন্ন জাতির লোক। তাই এখানে যে ভাষাটি সবাই বুঝতে পারবে তা ছিল কেবলমাত্র ইংরেজীই। সুতরাং 'শিক্ষকের দায়িত্ব' সম্পর্কে ইংরেজীতে বক্তব্য প্রদান করা হয়।

আমি যে দেশেই যাই, আমার প্রোগ্রামের একটি বিশেষ অংশ হিসাবে আমি সেখানকার বড় কোন গ্রন্থাগার দেখি। নতুন কোন উপকারী গ্রন্থ পেলে তা ক্রয় করি। এখন পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ার কোন গ্রন্থাগারে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। আজ আসর নামাযের পর আমার মেজবানগণ আমার এ আশা পূরণ করেন। এজন্য আমাকে মেলবোর্ন শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় নিয়ে যান। একটি বড় গ্রন্থাগারে কিছু সময় অতিবাহিত করি। বর্তমানে পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা ও প্রচলিত অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের সমালোচনা এত অধিক হারে আসছে যে, প্রায় প্রত্যেক মাসে কোথাও না কোথাও কোন না কোন গ্রন্থ এ বিষয়ের উপর বাজারে আসছে। এ বিষয়েরই কয়েকটি গ্রন্থ এখানেও পেয়ে যাই। সেগুলো আমি সাথে নিয়ে আসি। মাগরিবের নামাযও মধ্য শহরের একটি মসজিদে আদায় করি।

এশার পর দারুল উলূম কলেজে 'অমুসলিম দেশে মুসলমানদের দায়িত্ব' আলোচ্য বিষয়ে আমার ভাষণ দানের ঘোষণা হয়েছিল। আজ ছুটির দিন থাকায় এবং দারুল উলূম কলেজ শহর থেকে বেশ দূরে হওয়ায় আয়োজকগণ বড় ধরনের কোন সমাবেশের প্রত্যাশা করছিলেন না। কিন্তু এশার আযানের সময় আমরা যখন কলেজের চৌহদ্দীর নিকট পৌছি, তখন পুরো চৌহদ্দী ও তার বাইরের জায়গা কার দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। এশার নামাযের জন্য মসজিদে স্থান সংকুলান হয় না। মহিলাদের

জন্য পৃথক হল কক্ষে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জানতে পারলাম যে, মহিলাদের সংখ্যা ছিল পুরুষদের চেয়েও অধিক। মূল ভাষণ হয় ইংরেজীতে। তবে প্রায় ছয়–সাতটি ভাষায় পৃথক পৃথক তরজমার ব্যবস্থা ছিল। এখানে সে ব্যবস্থা এভাবে হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন ভাষার শ্রোতারা পৃথক পৃথক দলে সমবেত হয়। প্রত্যেক দলে এক ব্যক্তি তাদের ভাষায় মূল ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে তার অনুবাদ করতে থাকে। নিয়মমাফিক ভাষণ দানের পর অনেক রাত পর্যন্ত দীর্ঘ সময় প্রশ্নোত্তরের বৈঠকও চলতে থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া রেডিওর (S.B.S) কিছু প্রতিনিধি সাক্ষাতকার নেওয়ার জন্য এসে অপেক্ষা করছিলেন। ভাষণদানের পর তাঁরা প্রায় আধাঘন্টার সাক্ষাতকার রেকর্ড করেন।

তারপরও ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও স্থানীয় সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকে। শুতে শুতে রাত ১২টা বেজে যায়।

মেলবোর্নে মিঃ নাসের আবদুল হাকিম নামের একজন মিসরী মুসলমান 'মুসলিম কমিউনিটি কোঅপারেটিভ' নামে (যার সংক্ষিপ্ত রূপ M.C.C.A. হওয়ার কারণে মানুষ একে 'মক্কা' উচ্চারণ করে) একটি অর্থ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার উদ্দেশ্য ইসলামের বিধান অনুপাতে পুঁজি বিনিয়োগের কাজ করা। তাঁর ও স্থানীয় আলেমগণের ইচ্ছা ছিল, আমি যেন প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করি এবং এটি শরীয়তের চাহিদা কী পরিমাণ পুরো করছে তা প্রত্যক্ষ করি। তাই ২রা মে মঙ্গলবার ৯টায় তাঁর অফিসে যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। অফিসটি মেলবোর্ন শহরে অবস্থিত। মিঃ নাসের আবদুল হাকিম আমার নিকট প্রতিষ্ঠানটির মূল অবকাঠামো বর্ণনা করলেন। যার সারকথা এই যে, মানুষ এই প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অতিরিক্ত অর্থ জমা করে তার শেয়ার লাভ করে এবং প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসানে শরীক হয়। তারপর প্রতিষ্ঠান ইসলামের বিনিয়োগের বিভিন্ন পন্থা মোতাবেক লোকদেরকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পুঁজির সংস্থান করে থাকে। এ পর্যন্ত এর তৎপরতার বড় অংশ আবাসিক গৃহের ব্যবস্থার জন্য ইসলামের ভিত্তিতে পুঁজি জোগান দেওয়া চলে আসছে। যাকে তারা Diminishing Partnership এর মূলনীতিতে খাড়া করেছে। অর্থাৎ

প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে যৌথভাবে বাড়ী ক্রয় করা হয়। বিশ শতাংশ মূল্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরিশোধ করে আর আশি শতাংশ করে প্রতিষ্ঠান। তারপর প্রতিষ্ঠান নিজের অংশ ঐ ব্যক্তিকে ভাড়া দেয় তারপর ক্রম ক্রমে ঐ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয় করতে থাকে অবশেষে সে সম্পূর্ণ বাড়ীর মালিক হয়ে যায়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে বাড়ীর মালিকানা লাভের জন্য সাধারণতঃ সুদের উপর ঋণ নিতে হয়, তাই শরীয়ত সম্মত কোন পন্থায় বাড়ী লাভ করা মুসলমানদের জন্য বড় একটি সমস্যা। আলহামদুলিল্লাহ, এখন সেসব দেশে এমন সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, যেগুলোর মাধ্যমে ইসলামী বিধান মত বাড়ীর মালিকানা লাভ করা সম্ভব হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিও এ ধরনেরই একটি প্রতিষ্ঠান। মিঃ নাসের আবদুল হাকিম বললেন, গত বছর প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের মধ্যে ৭ শতাংশ লভ্যাংশ বন্টন করা হয়েছে, যা এখানকার লভ্যাংশের হারের দিক থেকে একটি বড় ধরনের সফলতা।

বেশীর ভাগ দেশের ইসলামী অর্থ–প্রতিষ্ঠানগুলোর শরীয়তের বিষয়বস্তুসমূহের তত্ত্বাবধান করে থাকে একটি শরীয়া বোর্ড। এ প্রতিষ্ঠানটির এখনও এ ধরনের কোন শরীয়া বোর্ড নেই। আমি প্রস্তাব পেশ করি যে, আলহামদুলিল্লাহ অষ্ট্রেলিয়াতেই এমন অনেক আলেম ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা এ কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন। তাই এমন একটি শরীয়া বোর্ড গঠন করা জরুরী। যেন বাস্তবেই শরীয়ত মত কাজ হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের আস্থা লাভেও সক্ষম হয়। মিঃ নাসের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যে, ইনশাআল্লাহ তিনি সত্বরই এ প্রস্তাব অনুপাতে আমল করার চেষ্টা করবেন। মাশাআল্লাহ, মাওলানা মুফতী নজীব সাহেব আমাদের দারুল উলূম করাচীতে 'ইফতা'র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রে উচ্চতর যোগ্যতার অধিকারী আলেম। ইল্ম ও ফেকাহ্‌র উৎকৃষ্ট রুচির ধারক। আধুনিক সমস্যাদির ব্যাপারেও তাঁর ভাল দক্ষতা রয়েছে। ইংরেজী ভাষার উপরও তাঁর দখল রয়েছে। তিনি প্রায় দেড় বছর পূর্বেই আমাদের পরামর্শে অষ্ট্রেলিয়া এসেছেন। এ স্বল্প সময়ে আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি শুধুমাত্র দারুল উলূম কলেজে

শিক্ষাদান ও তার ব্যবস্থাপনার জটিল কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দিচ্ছেন তাই নয়, বরং তিনি একজন মুফতী হিসেবে এলাকার মুসলমানদের ধর্মীয় দিক নির্দেশনার কর্তব্যও দায়িত্বশীলতা ও একাগ্রতার সঙ্গে আদায় করছেন। আমি এম.সি.সি.আই এর কর্তৃপক্ষকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেই। ইনশাআল্লাহ তিনি এ কাজের জন্য তাদের উত্তম সহযোগী প্রমাণিত হবেন।

১২টার দিকে আমরা এ প্রতিষ্ঠানের কাজ থেকে অবসর হয়ে অল্প সময় মেলবোর্ন শহরের বিশেষ বিশেষ স্থান ঘুরে দেখি। ক্যানবেরা রাজধানী হওয়ার পূর্বে মেলবোর্ন কোন একসময় অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী ছিল। এটি দক্ষিণ–পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ার শেষ প্রান্ত। তারপর ছোট কয়েকটি দ্বীপ বাদ দিয়ে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সমুদ্রই সমুদ্র। এটি ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী। এর আশেপাশে স্বর্ণের অনেক খনি রয়েছে। যারফলে এটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। শহরের বেশীর ভাগ ভবন প্রাচীন বৃটিশ ঐতিহ্যের দর্পণ। তবে সমুদ্র–তীরের অদূরে আমেরিকান শৈলীর সুউচ্চ ভবনসমূহও দৃষ্টিগোচর হয়। এ অঞ্চলে শীত তুলনামূলক বেশী। তাছাড়া শহরটি ঘন ঘন ঋতু বদলের ব্যাপারেও সমগ্র অষ্ট্রেলিয়াতে প্রসিদ্ধ। সেদিন আবহাওয়া মনোমুগ্ধকর শীতল ছিল। সমুদ্রতীরের প্রশান্ত পরিবেশে কাটানো কয়েকটি মুহূর্ত আমাদের জন্য বড় আনন্দোদ্দীপক হয়।

সেদিনই মাগরিবের পর আশপাশের বহু আলেম ও প্রভাবশালী ব্যক্তি সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়। এশার পর পুনরায় আমার বক্তব্য ছিল। সেদিন আমি বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করে বেশী সময় গতদিনের অসম্পূর্ণ প্রশ্নসমূহের উত্তরদানে ব্যয় করি। অনেক রাত পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবেও প্রশ্নের ধারা অব্যাহত থাকে। বিরামহীন সফর আর প্রোগ্রামের কারণে দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি প্রবল হলেও আলহামদুলিল্লাহ, সাথে এই আত্মিক প্রশান্তিও লাভ হয় যে, এতে করে অনেকের সংশয় দূর হয় আর আমারও মুসলমান ভাই–বোনদের খেদমত করার সুযোগ লাভ হয়।

বুধবার সকাল ৯টায় আমাদেরকে সিডনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতে

হয়। আমরা সোয়া আটটার দিকে বিমানবন্দর পৌছে যাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারি যে, আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কারণে বিমান লেট হবে। মেলবোর্নের বন্ধুরা নিকটবর্তী একটি রেস্তোরাঁয় আমাকে নিয়ে বসেন। বারোটার সময় বিমান রওয়ানা করে। যে সমস্ত বিষয়ে পূর্বে পরামর্শ করার সময় হয়ে ওঠেনি, এ সময়টিতে তাঁরা সেই কমতি পূরণ করে নেন।

সিডনীতে

মেলবোর্ন থেকে সিডনী ১ ঘন্টার পথ। সিডনীর বন্ধুরা ১০টা থেকে বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা ১টার সময় সিডনী বিমানবন্দরে অবতরণ করি। মাওলানা ডঃ সাব্বির সাহেব স্বাগত জানানোর জন্য সবান্ধবে উপস্থিত ছিলেন। হযরত মাওলানা নাজমুল হাসান থানভী সাহেব (রহঃ)এর সাহেবজাদা নাযিরুল হাসান সাহেবও বিমানবন্দরে এসেছিলেন। বিমান বিলম্বের কারণে হাতে সময় ছিল কম। সিডনীর একটি শহরতলী এলাকা 'রুটিহল' নামে প্রসিদ্ধ। সেখানকারই জামে মসজিদ ও মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন ডঃ সাব্বির সাহেব। আজকের দিনটি আমাদেরকে সেখানেই অতিবাহিত করতে হবে। তাই বিমানবন্দর থেকে সোজা 'রুটিহল' চলে যাই। নামায ও আহার শেষে সামান্য সময় বিশ্রাম করি। আসরের পর ডঃ সাব্বির সাহেব আলেমদের সমাবেশ রেখেছিলেন। আমি ব্রিসবেন যাওয়ার পথে যখন সিডনীতে অবতরণ করেছিলাম, মাওলানা সাব্বির সাহেব তখনই বলেছিলেন যে, এমন কিছু স্থানীয় সমস্যা রয়েছে, যেগুলোর সিদ্ধান্ত এখানকার স্থানীয় আলেমগণ আপনার জন্য স্থগিত রেখেছেন। আজকের এ সমাবেশ সে উদ্দেশ্যেই আহবান করা হয়েছিল। সে সমস্ত সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল, চাঁদ দেখা সংক্রান্ত। এতে মতবিরোধের কারণে মুসলমানগণ বড় সমস্যার শিকার ছিলেন। এ বিষয়ে উদয়াচলের ভিন্নতার কারণে তাদের মতামতেও বিভিন্নতা ছিল। সুতরাং আসর ও মাগরিবের পর বিভিন্ন মতামত শ্রবণ এবং সেগুলোর উপর আলোচনার পর আল্লাহর মেহেরবানীতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ একটি ফর্মুলার উপর

একমত হন। তারপর তা লিখে সবাই তাতে স্বাক্ষর করেন। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, অষ্ট্রেলিয়ার আরো কিছু দলের লোক, যারা এ বৈঠকে হাজির হতে পারেনি, স্থানীয় উলামায়ে কেরাম তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরও ঐকমত লাভের চেষ্টা করবেন। মজলিস শেষ হতে হতে এশার আযান হয়ে যায়। নামাযের জন্য মসজিদে গিয়ে দেখি মসজিদ নামাযীদের দ্বারা জনাকীর্ণ। যদিও 'রুটিহলের' এই মসজিদ শহর থেকে বেশ দূরে অবস্থিত এবং আসর পর থেকে অবিরাম বৃষ্টিও হচ্ছিল এবং এটি ছুটির দিনও ছিল না, এতদসত্ত্বেও এত অধিক সংখ্যক মুসলমানের এখানে উপস্থিতি দ্বীনের সঙ্গে তাদের অসাধারণ হৃদ্যতার স্পষ্ট আলামত।

সারাদিনের সফর ও বিরামহীন ব্যস্ততার ফলে দেহ ও মনকে প্রবল ক্লান্তি আচ্ছন্ন করেছিল। কিন্তু উপস্থিত লোকদের আবেগ ও উদ্দীপনা দেখে অনুভূত হলো, যেন আপনাআপনিই মন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রথমে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দানের খেয়াল ছিল। কিন্তু উপস্থিত সুধীজনদের বরকতে এ বক্তব্যও প্রায় সোয়া ঘন্টা দীর্ঘ হয়। তারপর প্রশ্নোত্তরের বৈঠকও হয়। যাদের সঙ্গে আমার পূর্বে কোনদিন সাক্ষাত হয়নি, যাদেরকে কোনদিন আমি দেখিনি এবং তারাও আমাকে কখনো দেখেননি, যারা শুধুমাত্র ধর্মীয় বন্ধনের ভালবাসা হৃদয়ে পোষণ করে এত দূর থেকে এখানে এসেছেন, তাদের নিষ্ঠা ও ভালবাসা এমন এক মহামূল্যবান দৌলত, যার মূল্য পরিশোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাষণের পর তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের দৃশ্যটিও দর্শনীয় ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে এমন ছিলেন, যারা আমার লেখনীর মাধ্যমে আমাকে চিনতেন। অনেকে এমন ছিলেন, যারা শুধুমাত্র আমার নাম শুনেছিলেন। আর অনেকে এমন ছিলেন, যারা আমার সম্পর্কে পূর্ব থেকে কিছুই জানেন না। তারা কেবলমাত্র একথা জানতে পেরে এখানে এসেছিলেন যে, পাকিস্তান থেকে দ্বীনের একজন তালিবে ইলম এসেছে। সে দ্বীন সম্পর্কে কিছু কথা রাখবে।

ভাষণের পর অবস্থান স্থলে পৌঁছে জানতে পারি যে, দেশব্যাপী ভয়েস অব ইসলাম নামে মুসলমানদের একটি রেডিও রয়েছে। যার প্রোগ্রাম সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ায় শোনা হয়। সেই রেডিওর প্রতিনিধি

সাক্ষাতকার নেওয়ার জন্য বসে আছেন। প্রায় আধাঘন্টা তাদেরকে সাক্ষাতকার দানে ব্যয় হয়। তবে তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন। আশা করি যে, এতে করে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় পরিস্কার হবে ইনশাআল্লাহ ।

পূর্ব প্রোগ্রাম মোতাবেক আমাকে আগামীদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিনের তৃতীয় প্রহরে করাচীর উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করতে হবে। কিন্তু একে তো সিডনীর বন্ধুগণ এখানে আরো কিছুদিন থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন, দ্বিতীয়তঃ মাওলানা ডঃ সাব্বির সাহেবের সঙ্গে ক্যানবেরার লোকেরা যোগাযোগ করে প্রস্তাব করেছিলেন যে, জুমুআর দিনটি আমি যেন ক্যানবেরায় কাটাই এবং সেখানেই জুমুআর বক্তব্যও রাখি। কিন্তু বিমান ব্যবস্থা এমন ছিল যে, জুমুআর দিন ক্যানবেরায় কাটানো হলে সোমবার পর্যন্ত বিমানের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা হবে না। তৃতীয়তঃ হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক সাহেব (কুঃ ছিঃ)এর সাহেবজাদা জনাব নেজামুল হক থানভী সাহেব এবং হযরত মাওলানা নাজমুল হাসান থানভী সাহেব (রহঃ)এর সাহেবজাদা নাযিরুল হাসান থানভী সাহেব সিডনী থেকে প্রায় একশ' কিলোমিটার দূরে সেন্ট্রাল কোষ্টে বসবাস করেন। আমার পুরো সফরে জায়গায় জায়গায় এ মর্মে তাঁদের ফোন আসতে থাকে যে, অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থানের সময় কিছুটা বৃদ্ধি করে কমপক্ষে একদিন তাঁদের সঙ্গে সেন্ট্রাল কোষ্টে কাটানো হোক। এঁরা সবাই রাতের আহারের সময় মাওলানা সাব্বির সাহেবের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এ প্রস্তাব নিয়ে আসেন যে, শুক্রবার ও শনিবারের মধ্যবর্তী রাতে একটি বিমান সিঙ্গাপুর যায়। সেই বিমানযোগে শনিবার বিকাল নাগাদ করাচী পৌঁছা সম্ভব। আমি এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম, এমন সময় নিযামুল হক থানভী সাহেব বলেন যে, 'আপনি অনুমতি দিলে ওস্তাদ যওকের একটি কবিতা শুনাতাম, যা আমাদের অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়।'

তারপর তিনি তদীয় সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হকের (কুঃছিঃ) বিশেষ বাচনভঙ্গি ও সুরে এই কবিতা আবৃত্তি করে শোনান—

وہ صبح کو آئیں تو کروں باتوں میں دوپہر
اور چاہوں کہ دن تھوڑا سا ڈھل جائے تو اچھا
ڈھل جائے جو دن بھی تو اسی طرح کروں شام
اور چاہوں کہ گر آج سے کل جائے تو اچھا
جب کل ہو تو پھر یونہی کہوں کل کی طرح سے
گر آج کا دن بھی یونہی ٹل جائے تو اچھا
القصہ نہیں چاہتا جائیں وہ یہاں سے
دل ان کا یہیں کاش بہل جائے تو اچھا

"সে ভোরে এলে কথায় কথায় দুপুর করব,
আর চাব যে, দিন আরেকটু গড়িয়ে গেলে ভাল হত।
দিন গড়িয়ে গেলে এভাবেই সন্ধ্যা করব,
আর চাব যে, আজ না গিয়ে কাল গেলে ভাল হত।
আগামীকাল হলে, গতকালের মতই বলব যে,
আজকের দিনটিও এভাবে পার হলে ভাল হত,
মোটকথা, সে এখান থেকে চলে যাক তা চাইব না।
হায়! তার মনটা এখানেই বসে গেলে ভাল হত।"

এঁরা এমন মুহাব্বতের সঙ্গে এই ফরমায়েশ করেন যে, তাঁদের কথা রদ করতে পারলাম না। সিডনীর প্রভাবশালী মুসলমান জনাব সারোয়ার সাহেব সীট ও টিকিট পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে অস্ট্রেলিয়ায় আমার অবস্থান প্রায় দেড়দিন বেড়ে যায়। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত বন্ধুদের উপভোগ্য আসর চলতে থাকে। নেযামুল হক সাহেব এবং নাযিরুল হাসান সাহেব ভাল কাব্যরসের অধিকারী। তাই কিছুসময় কবিতা আবৃত্তিতেও অতিবাহিত হয়। মাশাআল্লাহ, ডঃ সাব্বির সাহেবকে এখানে ধর্মীয় পথ-নির্দেশনার কেন্দ্রীয় ও প্রধান ব্যক্তিত্ব মনে করা হয়। তিনি স্থানীয় অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। অবশেষে অনেক

রাতে বিছানায় যাওয়ার সুযোগ হয়।

৪ঠা মে বৃহস্পতিবার ফজরের পর মসজিদে আমার সংক্ষিপ্ত হাদীসের দরস (পাঠদান) হয়। নাস্তার পর ডাঃ সাব্বির সাহেব ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, এখানে কাছেই মেশিনে মুরগী জবাই করার অনেক বড় একটি ফ্যাক্টরী রয়েছে। সেটি পরিদর্শন করে দেখা যাক যে, এ পদ্ধতিতে ইসলামী বিধানমত জবাই করার দাবী পুরো হয় কিনা। যদিও আমি আমেরিকা, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতিতে জবাইয়ের বিভিন্ন কারখানা দেখেছি এবং এ বিষয়ে আমার আরবী পুস্তিকা 'আহকামুয্ যাবায়েহ'-তে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, কিন্তু মাওলানা সাব্বির সাহেব বললেন যে, এই ফ্যাক্টরীর জবাই করার পদ্ধতি কিছুটা ভিন্নরকম। এতে শরীয়তের দাবী পূরণের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এটি দেখা সমীচীন হবে। সুতরাং আমরা সবাই এই যান্ত্রিক জবাই কেন্দ্রে যাই। এর নাম Rootihill Homeboush Abott। এর মধ্যে প্রতিদিন গড়ে ষাট হাজার মুরগী জবাই হয়। আমি আমার 'আহকামুয্ যাবায়েহ' পুস্তিকায় লিখেছি যে, মেশিনের মাধ্যমে জবাই পদ্ধতিতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, প্রত্যেক মুরগীর উপর আল্লাহর নাম নেওয়া সম্ভব হয় না। অনেকে মেশিনের বোতাম চাপার সময় বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়। তারপর মেশিন দ্বারা সারাদিন হাজার হাজার মুরগী জবাই হতে থাকে। এ পদ্ধতিতে শরীয়ত প্রদত্ত শর্তসমূহ পুরো হওয়ার ব্যাপারে জটিল প্রশ্ন রয়েছে। তাই এ পর্যন্ত আমরা এটি জায়েয হওয়ার ফতোয়া দেইনি। কিন্তু এই কারখানার পদ্ধতি এই যে, মুরগী যখন মেশিনে ছুরির নিকট পৌঁছে, তখন এক ব্যক্তি মুরগীটিকে ছুরির দিকে ধাক্কা দেয়. এ ক্ষেত্রে তার জন্য প্রত্যেকটি মুরগী ধাক্কা দেওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া সম্ভব। যদিও এখনও কারখানায় এর উপর আমল হচ্ছে না, কিন্তু কারখানার লোকেরা এতে সম্মত রয়েছে যে, তারা এখানে মুসলমান কর্মচারী নিযুক্ত করবে, আর তারা মুরগীকে ছুরি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়বে। এ পদ্ধতিটি দেখার পর আমার মতও এদিকেই প্রবল হয় যে, এ পদ্ধতির উপর আমল করা হলে পশু হালাল হওয়ার সুযোগ হতে পারে।

জবাইখানা পরিদর্শনের পর আমরা ডাঃ সাব্বির সাহেব থেকে বিদায়

নিয়ে নেযামুল হক সাহেব এবং নাযিরুল হাসান সাহেবের সঙ্গে রওনা করি। মাওলানা আযীয সাহেবকে—যিনি ব্রিসবেন থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন—আজ দুপুরেই ব্রিসবেন ফিরে যেতে হবে। তাই সিডনী শহরটি এক চক্কর ঘুরে দেখার পর প্রথমে তাঁকে বিমানবন্দরে বিদায় জানাই। মাওলানা আসাদুল্লাহ তারেক সাহেবকেও সিডনীর কয়েকজন বন্ধুর নিকট থেকে যেতে হবে, তাই তিনিও এখান থেকে পৃথক হয়ে যান। এবার আমি সেন্ট্রাল কোষ্ট যাওয়ার উদ্দেশ্যে নেযামুল হক সাহেব ও নাযিরুল হাসান সাহেবের সঙ্গে রওয়ানা হই। পথে সিডনীর 'আবর্ন' (Auburn) মহল্লাটি পড়ে। এখানে তুরস্কের মুসলমানগণ একটি সুবিশাল ও সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন, যা ইস্তাম্বুলের সুলতান আহমদ মসজিদ (Blue Mosque) এর হুবহু অনুরূপ। একটি অমুসলিম দেশে এমন জমকালো মসজিদ দেখতে পেয়ে মন আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে। এ মসজিদের নিকটেই একটি বাড়ীতে নাযিরুল হাসান সাহেব পবিত্র কুরআন শিক্ষাদানের জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে মুসলমান ছেলেমেয়েরা পবিত্র কুরআনের হিফজ ও নাযেরা শিক্ষা করে থাকে। নাযিরুল হাসান সাহেব নিজে এবং তাঁর সম্মানিতা মা এখানে শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করছেন।

সেন্ট্রাল কোষ্টে

এখানে যোহর নামায আদায় করার পর আমরা সেন্ট্রাল কোষ্ট যাওয়ার উদ্দেশ্যে সিডনী থেকে বের হই। সেন্ট্রাল কোষ্ট সিডনীর উত্তরে একটি দীর্ঘ উপকূলীয় এলাকা, যা অনেকগুলো ছোট ছোট শহরের সমন্বয়ে গঠিত। তার মধ্যেকার একটি শহরের নাম ওয়েলং (Wyalong)। সেখানে এঁরা উভয়ে বাস করেন। সিডনী থেকে এ শহরের দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। কিন্তু হাইওয়ে এত পরিচ্ছন্ন যে, ঘন্টা/সোয়া ঘন্টায় এ দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। সম্পূর্ণ রাস্তাটি সবুজ শ্যামল উপত্যকাসমূহ, সবুজাবৃত পাহাড়সারি এবং সমুদ্র উপকূল দ্বারা পরিপূর্ণ। পথের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কারণে দূরত্বের অনুভূতিই হয়নি। মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে আমরা 'ওয়েলং' পৌঁছি। আমাদের অবস্থানস্থল থেকে প্রয় পাঁচ-সাত

কিলোমিটার দূরে একটি মসজিদ রয়েছে। এশার নামায আমরা সেই মসজিদে আদায় করি। এ মসজিদে আমার আগমন যদিও কোন বক্তৃতার উদ্দেশ্যে ছিল না, কিন্তু কিছু লোক আমার আগমনের ব্যাপারে অবগত হয়ে নিকটবর্তী বৃহত্তম শহর 'নিউক্যাসল' থেকে সফর করে এশার সময় এখানে এসে পৌঁছান। তাই এখানেও সংক্ষিপ্ত ভাষণ হয়।

এ মসজিদটি যিনি নির্মাণ করেছেন, তিনি ইন্দোনেশিয়ার একজন মুসলমান। এখানকার জনসমাজে তিনি রিযওয়ান সাহেব নামে পরিচিত। বর্তমানে তিনি অনেক ফ্যাক্টরীর মালিক এবং বড় অর্থশালী লোক। এশার নামাযের পর তিনি সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমার কক্ষে চলে আসেন। কথায় কথায় জনৈক ভদ্রলোক বললেন যে, রিযওয়ান সাহেব একজন নওমুসলিম। তাঁর আসল নাম 'রবার্ট ওয়ায়ু'। তখন রিযওয়ান সাহেব বললেন যে, প্রায় দশ বছর পূর্বে তিনি মুসলমান হয়েছেন। তারপর তিনি নিজের মুসলমান হওয়ার কাহিনী শোনালেন, যা বড় ঈমানোদ্দীপক। কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করা না হলে আমার ভ্রমণকাহিনী অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

তিনি বললেন যে, 'আমার দাদা যদিও মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তিনি একজন খৃষ্টান নারীকে বিবাহ করেন। সেই খৃষ্টান মহিলা (যিনি রিযওয়ান সাহেবের দাদী ছিলেন) তাঁর সমস্ত সন্তানকে খৃষ্টান বানান। তাদের মধ্যে আমার পিতাও ছিলেন। তাদের প্রভাবাধীনে আমিও খৃষ্টান ছিলাম। বাল্যকালে আমি মারাত্মক পর্যায়ের দুরন্ত ও ভবঘুরে ছিলাম। মাদক ও নেশাকর দ্রব্য থেকে আরম্ভ করে খুন ও ছিনতাই পর্যন্ত সব ধরনের অপকর্মে লিপ্ত ছিলাম। যদিও আমার সমমনা দুরন্ত বালকদের সঙ্গে থেকে থেকে এ সমস্ত অন্যায় অপকর্ম আমার দৈনন্দিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু কখনও কখনও আমার অন্তরের ঘুমন্ত মানুষটি জেগে উঠত, আর আমি উপলব্ধি করতাম যে, আমি মারাত্মক পাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছি। এমতসময়ে আমি কখনো কখনো চার্চে যেতাম এবং পাদ্রী সাহেবের নিকট আমার পাপের কথা বলতাম। পাদ্রী সাহেব আমার ক্ষমার জন্য দু'আ করে আমাকে নিশ্চিন্ত করতেন। অপরদিকে আমি যে প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করছিলাম, সেখানে আমার একজন মহিলা

শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলমান। তাঁর কথাগুলো আমার ভাল লাগত। তাই কখনো কখনো আমি তাঁর নিকট চলে যেতাম এবং তাঁর কাছেও আমার অবস্থা বর্ণনা করতাম। তখন তিনি আমাকে এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন যে, এ সমস্ত কাজের পরিণতি ইহ-পরকালেই খারাপ। আমার পিতা সেনাবাহিনীর উচ্চস্তরের একটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আমাকে একটি বি.এম.ডব্লিউ গাড়ী ক্রয় করে দিয়েছিলেন। গাড়ী চালানোর জন্য ড্রাইভার রাখা ছিল। সেও ছিল মুসলমান। এই মুসলমান ড্রাইভারটিও কখনো কখনো কথায় কথায় আমার সম্মুখে ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করত।

ইতোমধ্যে আমার মুসলমান দাদা অসুস্থ হন এবং আমি জানতে পারি যে, তিনি আমার জন্য একটি অছিয়তনামা সিলমোহরাঙ্কিত করে রেখেছেন এবং অছিয়ত করেছেন যে, তার মৃত্যুর পর যেন সে লেখাটি আমাকে দেওয়া হয়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, আমার দাদা ঐ লেখায় তার জায়গা-সম্পত্তি আমাকে দেওয়ার অছিয়ত করে গেছেন। কিছুদিন পর আমার দাদার মৃত্যু হলে অছিয়ত অনুযায়ী মোহরাঙ্কিত সেই খামটি আমাকে দেওয়া হয়। আমি খুব আনন্দিত ছিলাম যে, এই অছিয়তনামার ফলে আমি আরো সম্পদশালী হব। কিন্তু খামটি খুলে দেখে আমার বিস্ময় ও আক্ষেপের অন্ত রইল না। কারণ এটি ছিল একটি সাদা কাগজ, যার মধ্যে কোনরূপ অছিয়তের পরিবর্তে শুধুমাত্র এই কালিমাটি লেখা ছিল—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

কাগজটি দেখে আমার এতো মনোব্যথা হয় যে, আমি তা দ্বিখণ্ডিত করে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে সোজা আমার মুসলমান শিক্ষিকার নিকট চলে যাই। তাঁকে ঘটনাটি শুনাই। তিনি আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে আসেন, কাগজটি দেখেন এবং আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, তোমার দাদা তোমাকে জাগতিক ধনসম্পদের চেয়ে অনেক বড় নেয়ামত দানের অছিয়ত করেছেন যে, তুমি মুসলমান হও। কিন্তু আমি তাঁর কথা মানলাম না এবং পূর্ববৎ অপকর্মে লিপ্ত থাকলাম।"

তিনি বলেন যে, 'কিছুদিন পর পুনরায় একবার আমার মর্মপীড়া আমাকে চার্চে নিয়ে যায়। আমি পাদ্রী সাহেবকে বলি যে, আমি বারবার আপনার নিকট আসি আর আপনি আমাকে ক্ষমার সুসংবাদ শুনিয়ে ফিরে পাঠান, কিন্তু আমার জীবনে তো কোন পরিবর্তন আসে না। আমি পুনরায় নির্দ্বিধায় সে কাজগুলোই করতে আরম্ভ করি। পাদ্রী সাহেব পুনরায় সে কথাই বললেন যে, আমি যখন তোমার ক্ষমার জন্য দু'আ করছি, তখন তোমার আর কিসের চিন্তা? পাদ্রীর কথায় আমার ক্রোধের উদ্রেক হয়। আমি পকেট থেকে পিস্তল বের করে তার উপর এমনভাবে ফায়ার করি, যেন তিনি আহত হন কিন্তু বেঁচে থাকেন।'

তিনি বললেন যে, 'এ অঘটন ঘটিয়ে আমি বাইরে চলে এলে আমার মনের অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই এ ঘটনার পর আমার পালানোর কথা ছিল, কিন্তু আমি আমার অস্থিরতার কথা আমার মুসলমান ড্রাইভারকে বলি। ড্রাইভারটি এক পর্যায়ে আমাকে বলল—আমি আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে হয়ত আপনার অস্থিরতা লাঘব হবে। আমি সম্মতি প্রকাশ করলে সে আমাকে এমন একটি আসরে নিয়ে গেল, যেখানে অনেকগুলো লোক একত্রে বসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর যিকির করছিল। আমি যখন সে আসরে পৌঁছলাম, তখন আমার দেহের প্রত্যেকটি লোম দাঁড়িয়ে গেল। আমার উপর এক অবর্ণনীয় অবস্থা সওয়ার হল। যিকিরকারীদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আওয়াজ আমার শিরা-উপশিরায় বিস্তার লাভ করল। এই যিকির আমার উপর এমন এক যাদুময় প্রভাব ফেলল যে, আমার সমস্ত অস্তিত্ব কেঁপে উঠল। আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমি আপাদমস্তক বদলে গিয়েছি। আমি দ্রুত বাইরে চলে এসে আমার মুসলমান শিক্ষিকার নিকট চলে যাই। তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনাই। তখন তিনি উঠে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে সেই দ্বিখণ্ডিত কাগজটি তুলে আনেন, যা আমার দাদা আমার জন্য রেখে গিয়েছিলেন এবং আমি তা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আমার শিক্ষিকা ছিন্ন কাগজের টুকরোগুলোকে জোড়া দিয়ে আমাকে দেখালেন, তাতে লেখা ছিল—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

'আমার শিক্ষিকা বললেন যে, তোমার দাদার অছিয়তের উপর আমল করার মুহূর্ত চলে এসেছে। এখন তুমি এই কালিমার উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যাও। আমার জীবনে পূর্বেই ইনকিলাব এসেছিল। এই কালিমার সত্যতা আমার মর্মস্থলে প্রবিষ্ট হয়েছিল। আমি কোনরূপ বিলম্ব না করে ইসলাম কবুল করি।'

'ইসলাম কবুল করার পর আমি আমার খৃষ্টান পিতার নিকট যাই। তাকে বলি যে, আমি মুসলমান হয়েছি। আমার পিতা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যান। তিনি আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দেন। আমার বি.এম.ডব্লিউ গাড়িটি ফিরিয়ে নেন। তার সমস্ত সম্পদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু ইসলাম আমার অন্তরের ভালবাসার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। আমি কিছুদিন কয়েকজন মুসলমান দরবেশের নিকট অবস্থান করি। আমার অন্তরে এ কথা বসে যায় যে, আল্লাহর যিকিরই সবকিছু। তাই কিছুদিন পর আমি শহরের বাইরে একটি ঝুপড়ি বানাই। সেখানে দিনরাত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকিরে লিপ্ত থাকি। আমি এরূপ অনুভব করতাম যে, এই যিকির আমার পাপ-পঙ্কিল জীবনকে ধুয়ে পরিস্কার করে দিয়েছে। আমার সবকিছু এই যিকিরের বদৌলতেই হয়ে থাকে। আমি সে সময় নামায, রোযা এবং ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান সম্পর্কেও অনবহিত ছিলাম। কেবলমাত্র যিকিরের উপরই আমি আত্মতুষ্ট ছিলাম। ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য অল্প কিছু কাজ করতাম। তারপর আমার ঝুপড়িতে এসে যিকিরে লিপ্ত হতাম। এ অবস্থায় কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন আমি স্বপ্নযোগে একজন বুযুর্গ লোককে দেখতে পেলাম। তিনি বললেন যে, আমি (শায়েখ) আবদুল কাদের জিলানী। যে পন্থা তুমি অবলম্বন করেছো তা সঠিক নয়। ইসলাম এ চায় না যে, মানুষ দুনিয়া ছেড়ে বনে-জঙ্গলে গিয়ে বসবে আর শুধু যিকির করতে থাকবে। ইসলামে যিকির ছাড়া অন্যান্য ফরয ইবাদতও রয়েছে, যার শীর্ষ তালিকায় হল নামায। ইসলামই এ বিধান দিয়েছে যে, মানুষ সুন্নাত মোতাবেক অন্যান্য মানুষের সঙ্গে জীবন-যাপন করবে, তাই এখন তুমি জঙ্গল ছেড়ে শহরে চলে যাও। ইসলামের সঠিক শিক্ষা লাভ করে সে অনুপাতে জীবন অতিবাহিত কর।'

উক্ত স্বপ্ন দেখার পর আমি পুনরায় শহরে চলে আসি। আমার মুসলমান শিক্ষিকার নিকট থেকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করি। ইতোমধ্যে আমার পিতার ক্রোধও প্রশমিত হয়ে যায়। আমি হলাম তার সন্তান। আমাকে হারিয়ে তিনি পেরেশান ছিলেন। আমি পুনরায় শহরে এলে তিনি আমার সঙ্গে পুনরায় সন্তানের ন্যায় আচরণ আরম্ভ করেন। যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তিনি আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তার অনেকটা আমাকে ফিরিয়ে দেন। আমার মা অষ্ট্রেলিয়ায় থাকতেন। তিনিও ইন্দোনেশিয়ায় এসে আমার হারিয়ে যাওয়ার ফলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। আমি ফিরে আসার পর তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং আমাকে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি তাকে পরিস্কার ভাষায় বলে দেই যে, ইসলাম ছাড়ার কল্পনাও আমার জন্য অসম্ভব।'

'এ সময় আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা দেখা দেয়, যা আমার জীবনে অধিকতর গভীর প্রভাব ফেলে। আমার পিতার এক মুসলমান বন্ধু সেনাবাহিনীর জেনারেল ছিলেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমি দেখতাম যে, তিনি মসজিদ নির্মাণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সেবামূলক কাজে বেশী বেশী অংশগ্রহণ করতেন। তার মৃত্যু হলে আমি তার জানাযায় অংশগ্রহণ করি। তাকে কবরে নামানোর সময় হলে তার সঙ্গে আমার আন্তরিকতার কারণে আমিই তার কবরে নামি। তারপর তাকে কবরে মাটিচাপা দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ফেরার পথে সময় দেখার জন্য ঘড়ি দেখতে গিয়ে দেখি, হাতে ঘড়ি নেই। ঘড়িটি ছিল খুবই দামী। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে, ঘড়িটি কবরে পড়ে গিয়েছে। তখন আমি কারো সঙ্গে কথাটি আলোচনা করিনি। রাতের বেলা মরহুমের আত্মীয়দের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করি। ঘড়িটি যেহেতু খুব দামী ছিল, তাই তার আত্মীয়রা প্রস্তাব করেন যে, সকালবেলা কবর খুঁড়ে ঘড়িটি বের করা হোক। কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর আমিও রাজি হয়ে যাই। সকালে কবর খনন করা হলে সেখানে এমন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পাই, যা আজও আমার দৃষ্টির আড়াল হয় না। যেই জেনারেল সাহেবকে আমরা দাফন করে এসেছিলাম, তিনি কবরের মধ্যে উপুড় হয়ে বসেছিলেন।

তার মুখ ভয়ঙ্কর রূপে খোলা ছিল। তার কনুই থেকে রক্ত ঝরছিল। বুক ও হাতে পায়ে নীল নীল দাগ ছিল। আমরা গত দিনের বিকাল চারটার দিকে তাকে দাফন করেছিলাম, আর এখন ছিল পরদিনের সকাল ৮টা–৯টা। অর্থাৎ দাফন করার পর ১৬/১৭ ঘন্টার অধিক সময়ও অতিবাহিত হয়নি। এ অল্প সময়ে তার লাশের এ দুরাবস্থা দেখে আমাদের সবার উপর এমন ভীতি সওয়ার হয় যে, আজও সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য সবসময় চোখের সামনে ভাসে।"

"আমি এই ঘটনা আমার মহিলা শিক্ষিকার নিকট আলোচনা করি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, জেনারেল সাহেব তো সেবামূলক কাজে খুব বেশী অংশ নিতেন, এতদসত্ত্বেও তার সঙ্গে এমন আচরণ কেন করা হলো? আমার শিক্ষিকা বললেন, কোন ব্যক্তিই অন্য কোন ব্যক্তির ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারে না। তাছাড়া সেবামূলক কাজে যদি এখলাছ না থাকে বরং সুনাম ও যশ–খ্যাতির জন্য তা করা হয় তাহলে আল্লাহর নিকট তার কোনই মূল্য নেই।"

"এই ঘটনার পর সবসময় আমার নিজের কবরের কথা স্মরণ হতে থাকে। আমি অধিকতর গুরুত্ব সহকারে আমার অবস্থা সংশোধনের ফিকির আরম্ভ করি। অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, আমি আমার বিধর্মী পিতার সঙ্গে না থেকে নিজের জন্য অন্য কোন পন্থায় জীবিকার সন্ধান করব। তাই আমি অষ্ট্রেলিয়া চলে আসি। শুরুর দিকে আমি বড় দারিদ্র্যের মধ্যে সময় কাটাই। সড়কের ছোট ছোট কাজ করে পেট চালাই। ...... (যে সময় রিযওয়ান সাহেব এ ঘটনাটি শোনাচ্ছিলেন তখন তার সঙ্গে অপর একজন ইন্দোনেশীয় মুসলমান বসা ছিলেন। তার দিকে ইঙ্গিত করে রিযওয়ান সাহেব বললেন ঃ তার নিকট জিজ্ঞাসা করুন, ইনি আমার সেই সময়ের বন্ধু। ঐ ব্যক্তি ঘটনার সত্যায়ন করলেন যে, বাস্তবিকই তখন ইনি খুব দরিদ্র অবস্থায় অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করছিলেন)। কিন্তু আমি আমার অতীত জীবন থেকে দুটি শিক্ষা লাভ করেছিলাম। একটি হল আল্লাহ তাআলার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক রাখতে হবে এবং তাঁর বিধান মোতাবেক আমল করতে হবে। দ্বিতীয়, যে কাজই করা হবে এখলাছ ও মহব্বতের সঙ্গে করতে হবে। এই দুই মূলনীতির উপর অটল

থেকে আমি সর্ববিষয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে থাকি। বেশী বেশী নামায আদায় করতে থাকি। সবসময় আমি আমার সম্মুখে আমার কবর দেখতে পাই। অবশেষে আমার জন্য রিযিকের দরজা উন্মোচিত হতে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমি অনেকগুলো ফ্যাক্টরীর মালিক।"

রিযওয়ান সাহেব দীর্ঘ এ কাহিনী শেষ করলে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে যারা তাকে অনেকদিন ধরে চেনেন, তারা বললেন যে, ইতিপূর্বে তাদেরও তার এই পূর্ণ কাহিনী সম্পর্কে জানা ছিল না। আজ প্রথমবার তিনি এ ঘটনা সবিস্তারে শোনালেন। স্মর্তব্য যে, এই রিযওয়ান সাহেব ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্টের শ্বশুরকূলের আত্মীয় (তিনি তার সঙ্গের আত্মীয়তার সঠিক সম্পর্কের কথা বলেও ছিলেন। কিন্তু এখন তা আমার স্মরণ নেই)। এই আত্মীয়তার ভিত্তিতে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার অকৃত্রিম সম্পর্ক রয়েছে। তার এ কাহিনীর কিছু দিক বিস্ময়কর অবশ্যই, কিন্তু আমার নিকট তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে মিথ্যা বলার বা অতিরঞ্জনের কোন সম্ভাবনা চোখে পড়ে নাই।

সেন্ট্রাল কোষ্টের বন্ধুরা বললেন যে, রিযওয়ান সাহেব বর্তমানে মুসলমানদের সামাজিক কাজে খুব বেশী বেশী অংশগ্রহণ করেন। ওয়াইঅংয়ের সুদৃশ্য যেই মসজিদটিতে আমরা এশার নামায আদায় করি, তা তিনিই নির্মাণ করেছেন। তিনি মসজিদটির নাম 'মাসজিদুল কহ্হার' এজন্য রেখেছেন যে, তার সেই শিক্ষিকা—যাঁর উছিলায় তিনি ইসলামের দৌলত লাভ করেছেন—ইন্দোনেশিয়ার যে মাদরাসায় পড়াতেন, তার নাম ছিল 'আল–কহ্হার'। এছাড়া তিনি তার এক ফ্যাক্টরীর সঙ্গে একটি নামায ঘর বানিয়েছেন, সেখানেও পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয়, পরদিন সকালবেলা আমরা সেই নামায ঘরেই ফজর নামায আদায় করি।

নাস্তার পর আমার মেজবান আমাকে সেন্ট্রাল কোষ্টের একটি বিনোদন কেন্দ্র এনটারেন্স (Enterance)–এ নিয়ে যান। এটি মূলতঃ সেই জায়গা, যেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগর একটি উপসাগরের রূপ ধরে স্থলভাগের ভিতরে প্রবেশ করেছে। তারপর কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে তা অনেকগুলো নদীর রূপ ধারণ করেছে। নদীগুলোর তীরসমূহ

সবুজ–শ্যামল পাহাড় দ্বারা পরিপূর্ণ। অষ্ট্রেলিয়ার এই পূর্ব উপকূল নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী দ্বারা সমৃদ্ধশালী। যা দেখে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে—

تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ।'

কবি বলেন—

اس آئنہ خانے میں سبھی عکس ہیں تیرے
اس آئنہ خانے میں تو یکتا ہی رہیگا

'এ জগত হল একটি আয়না, যেখানে সবই তোমার প্রতিবিম্ব।
এখানে একমাত্র তুমিই চিরন্তন, তুমিই শাশ্বত।'

জাভেদ আকবর সাহেব এতদঅঞ্চলের একজন প্রভাবশালী হৃদয়বান মুসলমান। তিনি কিছুদিন ধরে এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার আইন ব্যবস্থায় মুসলমানদের 'পার্সোনাল ল" সরকারী পর্যায়ে স্বীকৃত ও গৃহীত হোক। এ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য তিনি একবার আমার নিকট করাচীতেও এসেছিলেন। তিনি এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যে সমস্ত পত্রালাপ করেছেন এবং যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তা দেখানোর জন্য তিনি আমাকে স্বগৃহে নিয়ে যান। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মতবিনিময় হয় এবং ভবিষ্যত কর্মসূচী তৈরী করা হয়। ইতোমধ্যে জুমুআর নামাযের সময় ঘনিয়ে আসে। আমরা ওয়েলংয়ের 'আল–কহ্হার' মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করি। সেখানে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণও হয়।

মাগরিবের পর আমরা ওয়েলং থেকে রওনা হই। সাড়ে সাতটার দিকে সিডনী পৌঁছি। এখানে মুহতারাম সরোয়ার সাহেব রাতের খাবারে কিছু লোক সমবেত করেন। সেখানে কিছু সময় কাটানোর পর আমরা এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা করি। যাওয়ার পথে তারা সিডনীর সুপ্রসিদ্ধ হারবার ব্রীজের নিকট দিয়ে গাড়ী নিয়ে যান। যদিও দিনের বেলায় আমরা এ এলাকা দেখেছিলাম, কিন্তু রাতের বেলা আলোকোজ্জ্বল আকাশচুম্বী ভবনসমূহ এবং সমুদ্রে পতিত তার প্রতিবিম্বের এই দৃশ্য

ভিন্নরকমের উপভোগ্য ছিল।

বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখি, সেখানে রিযওয়ান সাহেবও (যার দীর্ঘ কাহিনী আমি এইমাত্র বর্ণনা করেছি) আমাকে বিদায় জানানোর জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছেন। তিনি তার এক ব্যবসার পরিকল্পনা সম্পর্কেও পরামর্শ করেন। পরিশেষে সমস্ত বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে আমি সাড়ে নয়টায় অষ্ট্রেলিয়ার কোয়ান্টাস এয়ারলাইন্স–এ আরোহণ করি। বিমানটি প্রথমে মেলবোর্ন অবতরণ করে, তারপর রাত সাড়ে বারোটায় সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মা'আরিফুল কুরআনের পঞ্চম খণ্ডের যে কাজ আমি সাথে এনেছিলাম তা আল্লাহর মেহেরবানীতে মেলবোর্ন থেকে রওনা হওয়া নাগাদ প্রায় সমাপ্ত হয়ে যায়। অল্প কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র বাকী থাকে। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। যখন চোখ খুলি, তখন সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছে। বিমান সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে অবতরণ করতে আরম্ভ করেছে। ভোর ছয়টায় বিমান সিঙ্গাপুরে অবতরণ করে। সিঙ্গাপুরে নিয়োজিত পাকিস্তানের হাইকমিশনার জনাব তাওহীদ সাহেব আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাওহীদ সাহেবের সঙ্গে আমার আগে থেকেই জানাশোনা রয়েছে। কিন্তু আমার জানা ছিল না যে, তিনি বর্তমানে সিঙ্গাপুরে রয়েছেন। সিডনীতে নিয়োজিত আমাদের কনস্যুলেট সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনের নিকট ফ্যাক্স পাঠালে তাওহীদ সাহেব আমার আসার বিষয়ে অবগত হন। তিনি তাঁর ভালবাসার কারণে নিজেই স্বাগত জানানোর জন্য চলে আসেন। আমার জন্য এখানে এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে একটি হোটেল বুক করা ছিল। কিন্তু তাওহীদ সাহেব এই কয়েক ঘন্টা তাঁর বাড়ীতেই কাটানোর জন্য পীড়াপীড়ি করেন। সুতরাং তিনি আমাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান। সিঙ্গাপুরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা অরচার্ড–এ বাড়ীটি অবস্থিত। এখানে আমি কিছু সময় বিশ্রাম করি এবং মা'আরিফুল কুরআনের অবশিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো শেষ করি। পরবর্তীতে তাওহীদ সাহেব সিঙ্গাপুরের অবস্থা বর্ণনা করেন। দেশটি ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করার পর কত দ্রুত উন্নতি করে এবং তার পিছনে কি কি কারণ রয়েছে, সেগুলো তিনি আলোচনা করেন। এই কথাবার্তার মধ্যে বিমান রওনা হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। তাওহীদ

সাহেবের সঙ্গে আমি পুনরায় বিমানবন্দরে চলে যাই। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের বিমান দুপুর আড়াইটায় করাচীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এখান থেকে করাচী পাঁচ ঘন্টার পথ। আমি এ সময়টিকে অষ্ট্রেলিয়ার এই ভ্রমণকাহিনী লেখার কাজে ব্যয় করি। অবশেষে পাকিস্তানের সময় অনুপাতে ৬ই মে শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় করাচী ফিরে আসি। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রতিক্রিয়া

অষ্ট্রেলিয়ায় অতিবাহিত এ নয়টি দিন যেন চোখের পলকেই শেষ হয়ে গেল। আমার মেজবানদের অনুযোগ ছিল এবং আমারও অনুভূত হয় যে, অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশ ভ্রমণের জন্য নয়দিন সময় নিতান্তই অপ্রতুল। তবুও এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়া ও সেখানকার মুসলমানদের অবস্থা দেখার ও জানার যথেষ্ট সুযোগ লাভ হয়। প্রত্যেক ভাষার ও প্রত্যেক চিন্তাধারার মুসলমানগণ আমার সঙ্গে যে ভালবাসা, উষ্ণতা ও অতিথিপরায়ণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান, তার চিত্র অন্তর থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। এঁরা প্রতিকূল পরিবেশে যেভাবে নিজেদের ইসলামী স্বকীয়তাকে সংরক্ষণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তা অতি প্রশংসার যোগ্য। ধর্মীয় জ্ঞান লাভের জন্য তাঁদের আগ্রহ ও একাগ্রতা এ থেকে ফুটে ওঠে যে, আমার প্রত্যেকটি ভাষণে মানুষ অনেক সময় শত শত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আসে। সর্বশ্রেণীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক এ সমস্ত ভাষণ অত্যাধিক আগ্রহ ও একাগ্রতার সঙ্গে শ্রবণ করেন এবং সেগুলো ক্যাসেটে রেকর্ড করা হয়। প্রত্যেক ভাষণের পর প্রশ্নের চিরকুটসমূহের স্তূপ বলছিল যে, মানুষ অতি সূক্ষ্মদৃষ্টির সঙ্গে এমন সব মাসআলা জিজ্ঞেস করছে, যেগুলো অনেক সময় আমাদের নিজেদের দেশেও শোনা যায় না। মহিলা ও তরুণ যুবকরাও এ আগ্রহে বয়ঃবৃদ্ধ পুরুষদের চেয়ে কোনক্রমেই পিছিয়ে ছিলেন না।

অষ্ট্রেলিয়ার মুসলমানগণ দেশব্যাপী বিশাল সংগঠন 'অষ্ট্রেলিয়ান ফেডারেশন অব ইসলামিক কাউন্সিলস' (AFIC)এর সঙ্গে জড়িত। এই সংগঠনের নেটওয়ার্ক মহল্লা পর্যায়ে বিস্তৃত। এ বিষয়টি আনন্দদায়ক যে, এ সংগঠনে ভাষা বা চিন্তাধারা ভিত্তিক কোন দলাদলি নেই। সমস্ত ভাষার এবং সমস্ত চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত মুসলমানগণ নিজেদের

সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত। এই সংগঠনের অধীনেই সারা দেশে অনেকগুলো শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেগুলো মোটের উপর কল্যাণকর সেবাদান করছে।

তাবলীগ জামাতের কাজ মাশাআল্লাহ প্রত্যেক দেশে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে দেখা যায়। আল্লাহর মেহেরবানীতে অষ্ট্রেলিয়াতেও তার কল্যাণকর প্রভাব পদে পদে উপলব্ধি হয়। তাবলীগ জামাত অষ্ট্রেলিয়াতেই শুধু নয়, বরং আশে পাশের ঐ সমস্ত ছোট ছোট দ্বীপেও ইসলামের তাবলীগ করছে, যেখানে কালিমাধারী কোন মুসলমান অতি কষ্টেই পাওয়া যায়। এছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় জাগৃতির যে লহর দৃষ্টিগোচর হয়, তা সৃষ্টি ও উন্নতি দানে তাবলীগ জামাতের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। মেলবোর্নের দারুল উলূম কলেজ—যা অষ্ট্রেলিয়ায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—মূলতঃ তাবলীগ জামাতের লোকদেরই প্রচেষ্টার ফল।

এ সমস্ত প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অষ্ট্রেলিয়ার মুসলমানগণও ঐ সমস্ত সমস্যার শিকার, যেগুলো অমুসলিম দেশসমূহে বিশেষ করে পশ্চিমা দেশসমূহে মুসলমানদের সম্মুখে রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার সমস্যা। শিশুরা দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে লেখাপড়া করলে সেখানকার পরিবেশ দ্বারা তারা প্রভাবান্বিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী বিষয়। মা-বাবাগণ তাদের বিশেষভাবে তত্ত্বাবধায়ন না করলে—যা কিনা খুবই কঠিন ব্যাপার—তাদের দ্বীন, ঈমান, আখলাক ও আমলের সংরক্ষণের কোন পথ নেই। সুতরাং যে সমস্ত মা-বাবা এদিক থেকে নিজেদের সন্তানদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেন নাই, তারা নিজেদের সন্তানদেরকে নিজেদের হাতছাড়া করেছেন। বিশেষ করে মেয়েদের বিষয়টি চরম জটিল। এমন ঘটনাও অনেক ঘটেছে যে, মেয়েরা বিধর্মীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চলে গেছে। আর মা-বাবাকে শুধু তাকিয়েই থাকতে হয়েছে, তারা কিছুই করতে পারেননি। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হল, মুসলমানদেরকে নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেরা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং সন্তানদেরকে শুরু থেকেই ইসলামী পরিবেশ যোগান দিতে হবে। আমি এ সমস্ত দেশে এই প্রয়োজনীয় বিষয়টির উপর সবসময়ই জোর দিয়ে আসছি এবং তাদের নিকট আরজ করে আসছি যে, এটি মুসলমানদের জীবন-মরণ সমস্যা।

আল্লাহর মেহেরবানীতে অনেক জায়গার লোকেরা এদিকে দৃষ্টি দিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ায় এ চেতনা আমি অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক উপলব্ধি করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত মুসলমানদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তবু এতে ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধি ঘটছে।

মুসলমানদের বড় একটি সমস্যা এও রয়েছে যে, এখন পর্যন্ত বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার বিষয়ে তাদের 'পার্সোনাল ল" ঐ সমস্ত দেশে স্বীকৃত ও গৃহীত নয়, যার ফলে অনেক পরিবার জটিল সমস্যার শিকার রয়েছে। আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক ধর্মের লোকদের পার্সোনাল ল' স্বীকৃত। যে সমস্ত ধর্মের লোক অতি অল্পসংখ্যক, তাদের বিবাহ, তালাক ইত্যাদির ফায়সালা তাদেরই ধর্মমতে হয়ে থাকে। কিন্তু এ সমস্ত দেশ, যারা কিনা নিজেরা নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষবাদী বলে থাকে এবং নিজেরা নিজেদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতার ধ্বজাধারী আখ্যা দিয়ে থাকে, তারা নিজেদের অধিবাসীদের এই বিশাল সংখ্যক লোককে এখনও পর্যন্ত তাদের বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকারের ফায়সালা তাদের নিজেদের ধর্মমতে সম্পাদন করার অধিকার দিতে প্রস্তুত নয়। আমি অষ্ট্রেলিয়ার কতিপয় প্রভাবশালী মুসলমানের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে, তারা যেন তাদের সরকারকে এই প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগী করে এবং যেভাবে মরিশাস ও ভারত প্রভৃতি দেশে মুসলমানদের পার্সোনাল ল' স্বীকৃত রয়েছে, তেমনিভাবে এখানেও যেন তা মঞ্জুর করা হয়। এ ব্যাপারে প্রাথমিক কিছু তৎপরতা ইতোমধ্যে আরম্ভও হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ, অষ্ট্রেলিয়ায় মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর ভাল আর সম্ভবতঃ এ কারণেই মানুষ সেখানে বসবাস করাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু আমি আমার এ প্রতিক্রিয়া সেখানেও প্রকাশ না করে পারিনি যে, নিজের দেশে হাজার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তা নিজের দেশ। অন্য দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে স্বর্ণ-চাঁদি নিয়ে খেলা করা যেতে পারে কিন্তু অন্তর ও অন্তঃস্থলের সেই প্রশান্তি লাভ করা অতি দুরূহ, যা পরিচিত ও নিজস্ব পরিবেশে অবস্থান করে লাভ করা যায়।

আয়ারল্যাণ্ড ও অক্সফোর্ডে এক সপ্তাহ

পাশ্চাত্যের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের বহু সংখ্যক মুসলমানের বসবাস রয়েছে। তারা ঐ সমস্ত দেশকেই নিজেদের দেশরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। ফলে সে সমস্ত স্থানে ইসলামী প্রতীক ও নিদর্শনসমূহের বহিঃপ্রকাশ ও প্রদর্শন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামী সভ্যতার নিদর্শনসমূহ এ সমস্ত দেশে এখন আর অপরিচিত নয়। এর সাথে সাথে সে সমস্ত দেশের সার্বিক ও ব্যাপক ধর্মহীনতার পরিবেশে মুসলমানগণ বহুবিধ সমস্যারও মুখোমুখি। যেগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁরা বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সে সমস্ত সমস্যার মধ্য থেকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—নিজেদের ও নিজেদের বংশধরদের ইসলামী স্বকীয়তার সংরক্ষণ। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুসংখ্যক মুসলমান এমনও রয়েছে, যারা পাশ্চাত্য দেশসমূহের কৃষ্টি–কালচারের সঙ্গে এমন মারাত্মকভাবে একাকার হয়ে গিয়েছে যে, তা তাদের ইসলামী পরিচয়কে হয়ত একেবারেই বিলুপ্ত করে দিয়েছে, কিংবা কেবল নামেমাত্র তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে থাকে এবং মনে করে থাকে। কিন্তু তাদের বাস্তব জীবনে না এর কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, না তাদের মধ্যে নিজেদের হৃত সেই পুঁজিকে পুনরায় অর্জন করার কোন চিন্তাই রয়েছে। অপরদিকে এমন মুসলমানের সংখ্যাও অনেক এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে তাঁদের সংখ্যা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যাঁরা নিজেদের ইসলামী পরিচয়কে কেবল টিকিয়েই রাখেনি, বরং তাকে ঐ সমস্ত দেশে গ্রহণযোগ্যও করে তুলেছে। তাঁদের চিন্তা হল, তারা অনৈসলামী এ সমস্ত দেশে বসবাস করেও নিজেদের জীবনকে শরীয়তের অনুশাসনের অনুগামী রাখবে। তাই তাঁদের কর্মধারায় হালাল ও হারাম এবং জায়েয ও নাজায়েযের তারতম্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বরং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, এমন অনেক লোক রয়েছেন, যারা

মুসলমান দেশে থাকতে নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে এত চিন্তাশীল ছিলেন না, যতটা পাশ্চাত্যে আসার পর হয়েছেন।

এদিকে সমগ্র বিশ্বে সাধারণভাবে এবং পশ্চিমা দেশসমূহে বিশেষভাবে জীবনের অবকাঠামো এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে, সেখানে প্রত্যহ নিত্য–নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তার মধ্যে এমন কিছু সমস্যাও রয়েছে, পূর্বে যেগুলোর কল্পনাও করা যেত না। সুতরাং প্রতিদিনের ডাকে খোদ আমার নিকটই এ জাতীয় অনেক প্রশ্ন এসে থাকে। পশ্চিমা দেশসমূহের মুসলমান অধিবাসীগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ সমস্ত সমস্যার শরয়ী সমাধান অবগত হতে চান। তার মধ্যে অনেক সমস্যার উত্তরদানের জন্য গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিবেচনার প্রয়োজন হয়। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন আলেম এ সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা–গবেষণা করে থাকেন। সহজাতভাবেই অনেক সময় এ সমস্ত আলেমদের গবেষণার ফলাফলে মতদ্বৈততাও হয়ে থাকে। আবার এমনও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোতে এ সমস্ত আলেমদের বিভিন্ন মতামত ও তাঁদের দলীল–প্রমাণের উপর বিচার–বিশ্লেষণ করে সম্মিলিত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ও তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান সমগ্র ইউরোপব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মূলতঃ আরবের আলেমগণ প্রতিষ্ঠা করেন। এর আরবী নাম 'আল মাজলিসুল ইউরবী লিল ইফতা ওয়াল বুহুস' এবং ইংরেজী নাম (European Council For Fatwa and Research)। এর প্রেসিডেন্ট আরব বিশ্বের খ্যাতনামা আলিম শায়েখ ইউসুফ আল কারযাভী। বিভিন্ন ইউরোপীয়ান দেশের ইসলামী কেন্দ্রসমূহের পরিচালক আলেমগণ এর সদস্য। জুলাইয়ের শুরুতে একটি সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য আমি লণ্ডনে অবস্থান করছিলাম। শায়েখ ইউসুফ আল কারযাভী (যিনি আমার তালিবে ইলমসুলভ দুঃসাহসিক আচরণ সত্ত্বেও বহুদিন ধরে আমার প্রতি কৃপাশীল) সে সময় ফরমায়েশ করেন যে, 'আল মাজলিসুল ইউরোবীর' যে সমাবেশ ২৮শে আগষ্ট থেকে পহেলা সেপ্টেম্বর ২০০০ ঈসায়ী পর্যন্ত আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, আমি যেন তাতে অংশগ্রহণ করি। যদিও এতে অংশগ্রহণের অর্থ হল আমাকে

দুই মাস সময়ে ইউরোপের তিনটি সফর করতে হবে। যা দারুল উলূম করাচীর সহীহ বুখারী শরীফের দরস দানের দায়িত্ব থাকায় আমার জন্য সহজ ছিল না। কিন্তু শায়েখ কারাযাভী এবং পরবর্তীতে কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল শায়েখ হুসাইন হালাওয়ার বারবার আবেদনের ফলে আমি এই সফর করতে সম্মত হই।

২৭শে আগষ্টের রাতে আমি করাচী থেকে রওয়ানা হই। দুবাইয়ের পথে বৃটিশ এয়ারওয়েজ-যোগে ভোর সাড়ে ছয়টায় লণ্ডন অবতরণ করি এবং সেখান থেকেই একটি আইরিশ বিমানে সকাল নয়টায় আয়ারল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিন পৌঁছি। ডাবলিনের ইসলামী সেন্টার এ কনফারেন্সের আতিথ্যের দায়িত্ব সম্পাদন করছিল। তার প্রতিনিধিগণ স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষা সমাপনকারী আলিম মাওলানা ইসমাঈল সাহেব--যিনি এখানকার অপর একটি ইসলামী সেন্টারের দায়িত্বশীল—সবান্ধবে তাশরীফ এনেছিলেন। এঁরা ছাড়া আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১৬ ঘন্টার দীর্ঘ সফরের পর সেদিন বিকাল পর্যন্ত বিশ্রামের জন্য বিরতি ছিল। যার বেশীর ভাগ সময় আমার অবস্থানস্থল ষ্টালো ঘ্রান হোটেলে অতিবাহিত হয়।

আসরের পর কনফারেন্সের উদ্বোধনী অধিবেশন ছিল। হোটেল থেকে আনুমানিক পনের মিনিটের দূরত্বে 'ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অব আয়ারল্যাণ্ডের' আলীশান ভবনটি অবস্থিত। যা সুপ্রশস্ত ও সুদৃশ্য মসজিদ, শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য মাদরাসা এবং প্রচার ও প্রকাশনার একটি কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত। এই সুবিস্তৃত ও সুপ্রশস্ত ভবনটি দুবাইয়ের শায়েখ রাশেদ আল মাখতুমের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। বর্তমানে আয়ারল্যাণ্ডের সর্ববৃহৎ ইসলামী কেন্দ্র এটিই। মিসরের শায়েখ হালাওয়া এ সেন্টারটি পরিচালনা করছেন। এই সেন্টারেই একটি কনফারেন্স হলও রয়েছে। সেখানে চারদিন পর্যন্ত উক্ত ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের সমাবেশ চলতে থাকে। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত শায়েখ ইউসুফ আল কারযাভীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে উদ্বোধনী ভাষণ ছাড়াও কনফারেন্সে আলোচিতব্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ

করা হয় এবং যারা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাঁদের লেখাগুলো বিতরণ করা হয়।

আয়ারল্যাণ্ডের একজন পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত মুসলমান ব্যবসায়ী জনাব গোলাম বারী সাহেব এখানকার হাতেগোনা কিছু বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের অন্যতম। তাঁর ব্যবসার ষ্টোরসমূহ সারাদেশে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুসলমান ভাইদের খেদমত এবং ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের সবিশেষ তাওফীক দান করেছেন। তিনি এখানে ইসলামিক সেন্টার ও শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠায় পরিপূর্ণ অংশ নিয়েছেন। আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য তিনি বিমানবন্দরে এসেছিলেন। তখনই তিনি বলেছিলেন যে, কোন এক প্রয়োজনে তাঁর পাকিস্তান যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি এখানে আসার কারণে একদিনের জন্য তিনি যাত্রা পিছিয়ে দেন। আজ রাতে তিনি স্বগৃহে নৈশভোজের ব্যবস্থা করতে চান। সুতরাং তাঁর বাসনা মত মাগরিবের পর আমাকে তাঁর বাড়ীতে যেতে হয়। সেখানে মাগরিবের নামায হচ্ছিল প্রায় সাড়ে আটটায়। মাগরিবের পর তাঁর বাড়ীতে পৌঁছতে পৌঁছতে নয়টা বেজে যায়। তিনি ডাবলিনের বিশেষ বিশেষ বন্ধুদেরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। একটি অমুসলিম দেশে কোন মুসলমানের এ ধরনের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে মন আনন্দে ভরে যায়। বিশেষ করে যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে জনসেবা ও দ্বীনের খেদমতেরও তাওফীক দান করেন।

পরদিন সকাল নয়টা থেকে কনফারেন্সের মূল অধিবেশন শুরু হয়। সুদানের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা শায়েখ আলী আল ইমাম প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। শায়েখ আলী আল ইমাম সুদানের জ্ঞান ও ধর্মীয় জগতে অতি উঁচু পদে অধিষ্ঠিত। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি পবিত্র কুরআনের কেরাত বিষয়ে তাঁর ডক্টরেটের প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি পবিত্র কুরআনের মৌলিকত্বের ব্যাপারে প্রাচ্যবিদদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সন্দেহ ও সংশয়সমূহের সবিস্তারে উত্তর দান করেছেন। তিনি আরবী ছাড়া ইংরেজী ও জার্মানী ভাষা সম্পর্কেও অবগত। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর। তিনি তাঁর গ্রন্থ দু'টি অত্যন্ত ভালবাসা সহকারে আমাকে উপহার দেন।

বিশেষতঃ প্রথমোক্ত গ্রন্থটি একটি বড় প্রয়োজন পুরা করেছে।

কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে ঐ সমস্ত প্রশ্ন আলোচনায় আসে, যেগুলো ইউরোপের বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে মুসলমানগণ কাউন্সিল বরাবর পাঠিয়েছে। যোহর নাগাদ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তৈরী করা হয়। দু'টোর সময় যোহর নামায ও দুপুরের আহারের জন্য বিরতি দেওয়া হয়। তারপর বিকাল ছয়টা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত আমার সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অবশিষ্ট প্রশ্নসমূহের উত্তর নিয়ে আলোচনা হয় এবং সেগুলোর উত্তর তৈরী করা হয়।

মাগরিবের নামায আমাকে অপর একটি ইসলামী সেন্টারে পড়তে হয়। সেন্টারটি ডাবলিন নগরীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। সেখানে একটি নামায ঘর (অস্থায়ী মসজিদ) এবং 'মাদরাসায়ে নূরুল ইসলাম' নামে শিশুদের শিক্ষাদানের একটি মাদরাসা রয়েছে। মাদরাসাটি আমাদের মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সাহেবের পরিচালনাধীনে কাজ করছে। মাওলানা ইসমাঈল সাহেব একজন তরুণ আলিম। তিনি বৃটেনে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় দরসে নিযামীর শিক্ষা সমাপন করেন। অবশেষে আমাদের দারুল উলূম করাচীতে দু'বছর ফতওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বৃটেন ফিরে আসেন। আয়ারল্যাণ্ডের মুসলমানগণ তাঁকে ডাবলিন ডেকে আনেন। প্রথমে তিনি শায়েখ হুসাইন হালাওয়ার সঙ্গে ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে কাজ করেন। তারপর গোলাম বারী সাহেবের নিমন্ত্রণে তিনি শহরের মধ্যভাগে এই ইসলামী সেন্টারটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি তা'লিম-তরবিয়ত ও ইসলাহী খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। মাদরাসায় পরিপূর্ণ শিক্ষাদানের দায়িত্ব সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাবলিনের প্রসিদ্ধ টরেন্টি কলেজে ইসলামী বিষয়সমূহের উপর সাপ্তাহিক লেকচারও দিয়ে থাকেন। তাতে মুসলিম ও অমুসলিম ছাত্রগণ অংশগ্রহণ করে থাকে। ডাবলিনের অন্যান্য জায়গায় এবং আয়ারল্যাণ্ডের অন্যান্য শহরেও তাঁর প্রোগ্রাম চলতে থাকে। তিনি আরবী ও ইংরেজী উভয় ভাষাতে সাবলীলভাবে ভাষণ দান করে থাকেন। এ অবস্থা দেখে বড়ই আনন্দিত হই যে, তিনি এই তরুণ বয়সেই প্রতিকূল পরিবেশে অবিচলতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর

পথ-নির্দেশে এখানকার মুসলমানগণ উপকৃত হচ্ছেন। যতজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে, তাদের সবাইকে তাঁর প্রশংসায় মুখরিত এবং তাঁর খিদমতে বাধিত দেখতে পেয়েছি।

মাগরিব নামাযের পর তাঁরই 'মাদরাসায়ে নূরুল ইসলামে' উর্দূ ও ইংরেজীতে আমার ভাষণ হয়। শ্রোতাদের মধ্যে পুরুষরা ছাড়া নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডে ভারত বা পাকিস্তানের আলিমদের আগমন অনেকটা না হওয়ারই সমান। তাই আমার মত তালিবে ইলমের কথা তারা সবাই গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করেন এবং আমার সঙ্গে অসাধারণ ভালবাসার আচরণ করেন। পূর্ব থেকে ঘোষণা না হওয়ায় সমাবেশ তেমন বড় ছিল না, তবে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন, দ্বীনের মুহাব্বত ও আজমত নিয়েই এসেছিলেন। তাই আল্লাহর মেহেরবানীতে মোটের উপর এ সমাবেশ উপকারী হয়।

কনফারেন্স পরের দিনও মাগরিব পর্যন্ত চালু থাকে। মাগরিব নামাযের জন্য আমাকে ডাবলিনের প্রাচীনতম মসজিদের সুদানী ইমাম সায়্যিদ ইয়াহইয়া সাহেব দাওয়াত করেছিলেন। সুতরাং মাগরিব নামায সেখানে আদায় করি। এটি ডাবলিনের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক মসজিদ, যা একটি চার্চের ভবন ক্রয় করে এখানকার মুসলমানগণ নির্মাণ করেছিলেন। ইসলামিক কালচারাল সেন্টার নির্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ডাবলিনের সর্ববৃহৎ ইসলামী সেন্টার এ মসজিদটিই ছিল। এটিও বেশ বড় মসজিদ। মসজিদের সঙ্গে মাদরাসা এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন অব আয়ারল্যাণ্ড নামে প্রচার ও প্রকাশনার একটি ইসলামী সেন্টারও রয়েছে। এ মসজিদের আশেপাশে বেশীর ভাগ আরবদের বসবাস বিধায় এখানকার নামাযীদেরও বেশীর ভাগ আরব। সুতরাং এখানে আমার ভাষণ হয় আরবীতে। তারপর মসজিদেরই একটি অংশে আমার বন্ধু ডঃ নাভিদ সাহেব নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন। ডঃ নাভিদ সাহেব পুরো সফরটিতে আমার সঙ্গে বড় ভালবাসার আচরণ করেন। তিনি নিজের গাড়ীতে করে আমাকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর মনোবাসনা ছিল, তাঁর নিজের বাড়ীতে নৈশভোজের ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু তাঁর বাড়ী ছিল বহু দূরে। তাই তিনি আমার ব্যস্ততা ও সুবিধার দিকে নজর দিয়ে মসজিদ

সংলগ্নেই নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন। তাতে অনেক বন্ধুই শরীক ছিলেন। নৈশভোজের পর ডঃ নাভিদ সাহেব ডাবলিন শহরটি একবার দ্রুত ঘুরিয়ে দেখানোর পর আমাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দেন।

বৃহস্পতিবার ছিল কনফারেন্সের শেষ দিন। ডাবলিন ভ্রমণে আমার একটি আকর্ষণ এ কারণেও ছিল যে, এখানকার চেষ্টার বিট্টি (Chester Beatty) প্রাচীন আরবী গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপিসমূহের বিশ্ববিখ্যাত একটি লাইব্রেরী। আমার তা ঘুরে দেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গত তিনদিনের বিরামহীন ব্যস্ততায় এ বাসনা পূরণের সুযোগ পাইনি। আজ সকালে কনফারেন্সের ড্রাফটিং কমিটির মিটিং ছিল। যা এই হোটেলেই অনুষ্ঠিত হয়। আমি সকাল দশটার মধ্যে এই মিটিং থেকে অবসর হই। কনফারেন্সের পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ এত বেশী জরুরী ছিল না। সুতরাং আমি মাওলানা ইসমাঈল সাহেব এবং ডাক্তার শাহজাদ সাহেবের সঙ্গে পূর্বেই সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, তাঁরা দশটার সময় এসে আমাকে লাইব্রেরীতে নিয়ে যাবেন। তাঁরা ওয়াদা মাফিক চলে আসেন। আয়ারল্যাণ্ডে মাশাআল্লাহ পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত বহু সংখ্যক ডাক্তার রয়েছেন। ডাক্তার শাহজাদ সাহেবও একজন দক্ষ ডাক্তার। তিনি আয়ারল্যাণ্ডের সেনাবাহিনীতে ডাক্তার পদে দায়িত্ব পালন করছেন। সাথে সাথে তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক তৎপরতাসমূহেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে লাইব্রেরীতে নিয়ে যাবেন বলে প্রস্তাব করেছিলেন।

ডাবলিন থেকে প্রায় তিন ঘন্টার দূরত্বে গালওয়ে নামে আয়ারল্যাণ্ডের অপর একটি শহর রয়েছে। সেখানেও একটি মসজিদ, মাদরাসা এবং ইসলামী সেন্টার রয়েছে। এর পরিচালনার দায়িত্ব মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেবের হাতে। মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেবও আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তাঁর মাতৃভূমি বৃটেন। কিন্তু তিনি উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য দারুল উলূম করাচীতে আসেন। দাওরায়ে হাদীস শেষে আমাদের এখান থেকে শিক্ষা সমাপন করেন। আমাদের এখানকার দাওরায়ে হাদীসের জামাতে সাধারণতঃ আড়াইশ'র মত ছাত্র থাকে। তাই ক্লাসের

মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্রের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যে সমস্ত ছাত্র পিছনের সারিতে বসে এবং খুব বেশী প্রশ্নোত্তর করে না, তাদের কথা মনে রাখা কঠিন হয়ে থাকে। মাওলানা ইলিয়াস সাহেবও এমনই নীরব প্রকৃতির তালিবে ইলম ছিলেন।

তিনি যখন আমাদের মাদরাসায় শিক্ষারত ছিলেন তখন তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়নি। এখানে আসার পর তাঁর হিরন্ময় যোগ্যতার পরিস্ফুটন ঘটে। মাশাআল্লাহ্, তিনি গালওয়েতে ধর্মীয় পথনির্দেশ দানের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এখানকার শিশুদের জন্য অনেকগুলো পুস্তকও লিখেছেন। অধিক অধ্যয়নের রুচির অধিকারী তিনি। ডাবলিনে আমার অবস্থানের সময় তিনি সেখানেই অবস্থান করেন এবং প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে তাঁর নীরব প্রকৃতি নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, চেষ্টার বিট্টি ছাড়া এখানে আরো একটি দর্শনীয় লাইব্রেরী রয়েছে। চেষ্টার বিট্টির খ্যাতির কারণে মানুষ সেখানে খুব বেশী গিয়ে থাকে। কিন্তু এ লাইব্রেরীটি সম্পর্কে মানুষ খুব বেশী জানে না বিধায় সেখানে পর্যটকদের আগমন কম হয়ে থাকে। মাওলানা ইলিয়াস সাহেব প্রথমে সেই লাইব্রেরীটি দেখার পরামর্শ দেন।

মারিশ লাইব্রেরী

এই লাইব্রেরীর নাম 'আর্চ বিশপ মারিশ লাইব্রেরী'। লাইব্রেরী'টি একটি পুরাতন চার্চের ভবনে অবস্থিত। এটি ডাবলিনের আর্চ বিশপ মারিশ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে, এটি ডাবলিনের সর্বপ্রথম পাবলিক লাইব্রেরী। আর্চ বিশপ মারিশ তার আয়ের বড় একটি অংশ এ সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহে ব্যয় করেন। আয়ারল্যাণ্ড সরকার এটিকে তার মূল আকৃতিতে সংরক্ষণ করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। সুতরাং ভবন ও তার সমস্ত কক্ষও প্রাচীন ধাঁচের। আলমারীসমূহও পুরাতন কাঠের। গ্রন্থসমূহকেও যদ্দুর সম্ভব পুরাতন ঢালে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে। লাইব্রেরীর হলকক্ষে প্রবেশ করার পর মানুষ অনুভব করে যে, সে চারশ' বছর পূর্বের যুগে প্রবেশ করেছে। লাইব্রেরীর একটি মজার অংশ ঐটি, যাকে Study cage অর্থাৎ 'অধ্যয়নের পিঞ্জিরা' নাম দেওয়া

হয়েছে। যে সমস্ত লোক লাইব্রেরীতে অধ্যয়ন করতে আসত, তাদেরকে এই অংশে একটি পিঞ্জিরা সদৃশ দরজার পিছনে আলমারীর সম্মুখে বসিয়ে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হত। যেন তারা অধ্যয়নান্তে বই চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে। এতে বোঝা যায় যে, সে যুগে বই চুরির ব্যাপক প্রচলন ছিল।

লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা আর্চ বিশপ মারিশের একটি লেখা ফ্রেমে বাঁধা রয়েছে। তাতে তিনি নিজের এক ভাতিজীর ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন যে, 'সে আল্লাহর ভয়ের পরোয়া না করে জনৈক ব্যক্তির সাথে পালিয়ে গেছে এবং যাওয়ার কালে লাইব্রেরীর কিছু বইও চুরি করে সঙ্গে নিয়ে গেছে।'

এই গ্রন্থাগারে বর্তমানে ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের অনেক বড় দুর্লভ সংগ্রহ রয়েছে। তার মধ্যে ল্যাটিন, ইংরেজী, আরবী, গ্রীক, সুরিয়ানী, ইবরানী, আরামায়ী, কাসদি, চালডাইক (Chaldaic), হাবসী, ফারসী ও তুর্কী ভাষার গ্রন্থসমূহ অন্তর্ভুক্ত। আর্চ বিশপ মারিশ প্রথম দিকে এখানে প্রাচ্যের গ্রন্থসমূহের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহেরও বিরাট বড় সংগ্রহ সঞ্চয় করেছিলেন। এজন্য তিনি হল্যাণ্ডের ল্যাডিন নগরী থেকে হস্তলিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি আনিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেখেন যে, ডাবলিনে এ সমস্ত পাণ্ডুলিপির যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, তাই তিনি ঐ সমস্ত পাণ্ডুলিপি অক্সফোর্ডের বোডলিয়ান (Bodleian) লাইব্রেরীকে প্রদান করেন।

লাইব্রেরীর ইনচার্জ–কর্মকর্তা খুব আগ্রহ সহকারে আমাকে লাইব্রেরী'টি পরিদর্শন করান। মাওলানা ইলিয়াস সাহেব তাঁকে আমার আগমন সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত করেছিলেন। তাই তিনি কয়েকটি দুর্লভ গ্রন্থ আমাকে দেখানোর জন্য বের করে পৃথক করে রেখেছিলেন। তার মধ্যে কুরআন শরীফের একটি কপি ছিল, যা ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর একজন প্রাচ্যবিদ আব্রাহাম হিঙ্কেলম্যান (Hinckelman) হামবুর্গ থেকে প্রকাশ করেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশসমূহে মনে করা হত যে, এটি পবিত্র কুরআনের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ। কিন্তু পরবর্তীতে ইতালীর ভেনিস শহরে মুদ্রিত একটি কপি আবিষ্কৃত হয়, যা ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ছাপা

হয়েছিল। তারপর থেকে এটিকেই পবিত্র কুরআনের প্রথম মুদ্রিত কপি মনে করা হতে থাকে। পবিত্র কুরআনের এই কপির সঙ্গে ল্যাটিন ভাষায় তার সংক্ষিপ্ত তরজমাও রয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কিত অপর একটি মজার কিতাব উত্তর হল্যাণ্ডের এক প্রাচ্যবিদ এড্রিয়ান রিল্যাণ্ড (Adrlan Reland)এর লেখা। তার ল্যাটিন নাম Mohammedica Libriduo De Religione। রিল্যাণ্ড মূলতঃ দর্শনের ছাত্র ছিলেন। তিনি এ গ্রন্থে ল্যাটিন ও আরবী ভাষায় ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও বিধি–বিধানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। ইসলামের আকীদা ও শিক্ষা সম্পর্কে যে সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তিনি সেগুলোরও উত্তর দিয়েছেন।

ইংরেজী ভাষায় পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অনুবাদক জর্জ সেল (George Sale)এর সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদের সর্বপ্রথম সংস্করণও এখানে রয়েছে। যা ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তার প্রচ্ছদে সে যুগের মক্কার হারম এলাকার একটি ছবিও ছাপানো রয়েছে। এর মাধ্যমে সে যুগের পবিত্র মক্কার একটি ধারণা মানুষ করতে পারে।

আরবী ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আজরুমিয়া'র একটি কপিও আমরা দেখি, যা ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের প্রাচ্যবিদ এরপেনিয়াস (Erpenius) ল্যাডিন থেকে প্রকাশ করেছিলেন। ইবনে সিনার আইন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ ইদরিসীর ভূগোল বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নুযহাতুল মাসালিকে'র ল্যাটিন অনুবাদও লাইব্রেরীতে রয়েছে, যা ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে ছেপেছিল।

এটি যেহেতু একজন খৃষ্টান আর্চ বিশপের লাইব্রেরী, তাই আমার ধারণা ছিল যে, এখানে বাইবেলের প্রাচীন কপি এবং তার ঐ সমস্ত পুরাতন ভাষ্য গ্রন্থসমূহও পাওয়া যাবে, যেগুলোকে আমি ঐ সময় থেকে তালাশ করে আসছি, যখন আমি হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানভী (রহঃ)এর 'ইযহারুল হক' গ্রন্থের কাজ করছিলাম। বাইবেলের পুরাতন কপি তো অনেক পেলাম, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সম্পূর্ণ বাইবেলের পরিপূর্ণ ভাষ্যগ্রন্থ একটিও পেলাম না। লাইব্রেরীর গ্রন্থতালিকা কম্পিউটারাইজড, কিন্তু কম্পিউটারের সাহায্যে কোন ভাষ্যগ্রন্থ না আমি পেলাম, না লাইব্রেরীর কর্মকর্তা। পরিশেষে আমি অনুরোধ করি যে,

কম্পিউটারে গ্রন্থতালিকা উঠানোর পূর্বে লাইব্রেরীর যে পুরাতন রেজিষ্টার রয়েছে, তাতে খুঁজে দেখা যাক। সংশ্লিষ্ট মহিলা আমার এ অনুরোধ রক্ষা করেন এবং আমার সম্মুখে পুরাতন রেজিষ্টার এনে দেন। ঐ রেজিষ্টারসমূহে আর না হলেও বাইবেলের বিভিন্ন অংশের ভাষ্যগ্রন্থসমূহ পাওয়া গেল। এগুলো পাওয়ার পর সে মহিলা বললেন, 'কম্পিউটার যত উন্নতিই করুক না কেন, মানুষের শূন্যতা পুরো করতে পারে না।' কিন্তু আমি যে সমস্ত গ্রন্থ তালাশ করছিলাম সেগুলো এখানেও পেলাম না। মহিলা অঙ্গিকার করলেন, তিনি খোঁজ চালিয়ে যাবেন। পাওয়া গেলে আমাকে ই-মেইলের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

যে সময় আমি 'ইযহারুল হক' গ্রন্থের উপর কাজ করছিলাম এবং খৃষ্টবাদ আমার অধ্যয়নের বিশেষ বিষয়বস্তু ছিল, সে সময় যদি আমি এরকম লাইব্রেরী পেতাম এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার উপ্রকরণ লাভ করতাম তাহলে আমি কয়েক মাস এতে কাটিয়ে দিতাম। 'ইযহারুল হক' গ্রন্থের উপর আমি এমন নিঃস্ব অবস্থায় কাজ করি যে, পাকিস্তানে প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যও আমাকে প্রতিদিন বিকেল বেলা দারুল উলূম কৌরঙ্গী থেকে বাসে ঝুলে শহরের লাইব্রেরীসমূহে যেতে হত। এখন এই লাইব্রেরী আমার সম্মুখে রয়েছে, যেখান থেকে নিশ্চয়ই খৃষ্টবাদের উপর অনেক কাজ করা সম্ভব এবং আলহামদুলিল্লাহ এখন এমন উপকরণও রয়েছে যে, আমি যতদিন ইচ্ছা এখানে অবস্থান করতে পারি, কিন্তু আমার সময়গুলো বিভিন্ন দায়িত্বে এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, এখন আর কিছু করা সম্ভব নয়। আর আজ তো আমার হাতে খুবই সীমিত সময় রয়েছে। তাই লাইব্রেরী থেকে উপকৃত হওয়ার এছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না যে, এখানকার ইনচার্জ তার ই-মেইল এড্রেস আমাকে দিয়ে দেন, যেন প্রয়োজনের সময় তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। তবে এ কথাটি এত বিস্তারিত এ জন্য লিখলাম যে, খৃষ্টবাদ-বিষয়ে যারা কাজ করছেন, তারা এ লাইব্রেরীর প্রাচীন সংগ্রহ দ্বারা উপকৃত হতে পারলে যেন অবশ্যই করেন।

চেষ্টার বিট্টি লাইব্রেরী

মারিশ লাইব্রেরী ঘুরে দেখার পর আমরা চেষ্টার বিট্টি লাইব্রেরীতে যাই। এটি শহরের মধ্যভাগে সুউচ্চ একটি ভবনে অবস্থিত। এ লাইব্রেরীটিরও তার প্রতিস্ঠাতার নামে নামকরণ করা হয়েছে। এর প্রতিস্ঠাতার নাম স্যার আলফ্রেড চেষ্টার বিট্টি (Sir Alfred Chester Beatty)। তার প্রতিস্ঠাকৃত এ লাইব্রেরীটি শুধুমাত্র বিশ্বের সমস্ত ধর্মের গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সমন্বিত। তাতে ইসলাম, খৃষ্টবাদ, ইহুদীবাদ, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধমত, জৈন, শিখ, তাও, শান্টু, সব ধর্মের গ্রন্থ সংগ্রহ রয়েছে। এ সমস্ত গ্রন্থ আরবী, ল্যাটিন, ইংরেজী, ফারসী, তুর্কী, উর্দূ, হিন্দী ইত্যাদি কত ভাষায় যে লেখা, তার ইয়ত্তা নেই। হস্তলিখিত আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহেরও এখানে বিরাট এক সংগ্রহ রয়েছে। যার শুধুমাত্র ক্যাটালগই আট ভলিউমের। এ লাইব্রেরীতে আমার আসার উদ্দেশ্য ছিল, এখানে কতিপয় প্রাচীন আরবী গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহ তার মূল রূপে দেখার সুযোগ পাব। কিন্তু এখানে এসে জানতে পারলাম যে, এ সমস্ত পাণ্ডুলিপি পৃথকভাবে বের করা থাকে না। বরং এর জন্য আগে থেকে তারিখ, সময় ও কোন্ গ্রন্থ তা নির্ধারণ করতে হয়। তাছাড়া সেগুলো পড়ে দেখার কোন সুযোগও নেই। তবে সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য তারা এমন একটি শোরুম বানিয়েছে, যেখানে হস্তলিপির বিভিন্ন নমুনা পরিদর্শন করানো হয়। সুতরাং এখানে একটি শোকেসের মধ্যে দশম খৃষ্ট শতাব্দীর (অর্থাৎ প্রায় তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর) লেখা পবিত্র কুরআনে কারীমের একটি কপি রয়েছে, যা স্পেনে লেখা হয়েছিল, এখনও তার ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি ও লিপির সৌন্দর্যের মধ্যে কোন তফাত সৃষ্টি হয়নি। পবিত্র কুরআনের এ কপিটি ছাড়া এই শোরুমে আমার আকর্ষণের মতো অন্য কিছু ছিল না। তবে লাইব্রেরীর আরবী গ্রন্থসমূহের ৮ ভলিউমের ক্যাটালগটি এখানে তুলনামূলক কম মূল্যে পাওয়া যায়। তাই আমি তা গনীমত মনে করে ক্রয় করি। সেই ক্যাটালগে সমস্ত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির পরিচিতি রয়েছে এবং তার পৃষ্ঠাসমূহের ছবিও দেওয়া রয়েছে। এর অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকারদের স্বহস্তে লিখিত।

ডাবলিনের এই দুই গ্রন্থাগারের ভ্রমণ বড় মনোমুগ্ধকর হয়। আমাদের

মহান পূর্বপুরুষদের গ্রন্থসমূহের এগুলোই সেই বিশাল ভাণ্ডার, যা ইউরোপের বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। যেগুলো দেখে প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল মরহুম বলেছিলেন—

وہ حکمت کے خزانے 'وہ کتابیں اپنے آبا کی
جو دیکھیں جا کے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ

'জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেই ভাণ্ডার এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই অমর গ্রন্থসমূহ, ইউরোপে গিয়ে যা দেখে আমার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।'

এ প্রশ্নটি সাধারণ্যের মস্তিষ্কে অনেক সময়ই জেগে থাকে যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ ইউরোপে কী করে পৌঁছল এবং ঐ সমস্ত অমুসলিম জাতি সেগুলোর এত অধিক সংরক্ষণ কেন করল? এ প্রশ্নের উত্তর যদিও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। সংক্ষিপ্ত এ ভ্রমণকাহিনী যা বর্ণনা করার পরিসর রাখে না, কিন্তু এর উত্তরের মধ্যে যেহেতু আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তাই সংক্ষেপে সেদিকে ইঙ্গিত করা যথার্থ হবে।

ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্বে সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ববৃহৎ কেন্দ্রসমূহ ছিল আলমে ইসলামে তথা মুসলিম বিশ্বে। সে যুগে অমুসলিম ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় সার্বিকভাবে খুব বেশী পরিচিত ছিল না। এ ব্যাপারে তারা মুসলিম বিশ্বের মুখাপেক্ষী ছিল। ইউরোপের শাসকগণ রাজপুত্রদেরকে উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য স্পেনে পাঠাত। কিন্তু যখন মুসলমানদের নিজেদের বদআমলের কারণে তাদের রাজনৈতিক ধস নামে, তখন আলমে ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার, ইউরোপিয়ান বিজয়ীদের হাতে যেতে আরম্ভ করে। স্পেনের পতনের পর সেখানকার ক্ষমতাশালী খৃষ্টান সরকার এত অধিক পরিমাণ সাম্প্রদায়িক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুশমন ছিল যে, সে মুসলমানদের গ্রন্থাগারসমূহ আগুনে ভস্মিভূত করে দেয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত ভাণ্ডার যে গ্রানাডার চৌরাস্তায় মাসকে মাস ভস্মিভূত হতে থাকে, তার গোনা জোখা নেই। তবে আমাদের মহান পূর্বপুরুষগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় এত অধিক পরিমাণ গ্রন্থভাণ্ডার তৈরী করেছিলেন যে, এভাবে জ্বালানো সত্ত্বেও

সেগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হতে পারেনি। জ্ঞানবন্ধু কিছু মানুষ এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও মুসলমানদের গ্রন্থসমূহ গোপন করে লুকিয়ে রাখেন, যখন এমন জ্ঞান-বন্ধুত্ব খৃষ্টানদের হাতে নিজেকে নিজে মৃত্যুর দাওয়াত দেওয়ার সমার্থক ছিল। তারপর ক্রমান্বয়ে যখন ইউরোপে বহুমুখী ধর্মচর্চা আরম্ভ হয়, তখন এ সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। ইউরোপের পুনর্জাগরণের (Renaissance) কারণসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ এও ছিল যে, যে সমস্ত লোক খৃষ্টবাদের বন্ধন ছিন্ন করে, তারা মুসলমানদের এ মহান জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। এই মাত্র আমি মারিশ লাইব্রেরীর কথা উল্লেখ করেছি, তার মুদ্রিত ক্যাটালগে ইবনে সিনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছে—

"ইবনে সিনা চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের উপর শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তদীয় রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'কানূনুত্ তিব্বি' গ্রন্থকে ইউরোপের ইউনিভার্সিটিসমূহে 'জ্ঞানভাণ্ডার' আখ্যা দেওয়া হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত পাঠ্যগ্রন্থরূপে তার পাঠদান করা হতে থাকে।"

(The Wisdom of the East : Marsh's Oriental Books P. 17)

তাই মুসলিম উম্মাহর মহান পূর্বসূরীদের এ সমস্ত গ্রন্থ যেহেতু ইউরোপের জন্য মহান কৃপাশীলের মর্যাদা রাখে তাই পুনর্জাগরণের পর ইউরোপ সেগুলো সংরক্ষণ করার প্রতি যত্নবান হয়। ইউরোপিয়ান জাতি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের পর তরবারীর জোরে এ সমস্ত গ্রন্থের বিরাটাংশ সেখান থেকে লাভ করে। আর ইউরোপের গ্রন্থাগারসমূহ ভালভাবে লক্ষ্য করলে এ বাস্তবতাও পরিলক্ষিত হয় যে, এর বিরাট একটি অংশ তারা মুসলমানদের থেকে ক্রয়ও করেছে। এটি ছিল মুসলমানদের একাডেমিক অধঃপতন ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার যুগ। তাই অনেক দুর্লভ গ্রন্থসংগ্রহ অমুসলিমদের হাতে বিক্রি করতে লোকদের শংকা বা সংকোচ হয়নি। শুরুর দিকে এ সমস্ত গ্রন্থের প্রতি ইউরোপবাসীর মনোযোগের আসল কারণ ছিল তাদের পুনর্জাগরণে এ সমস্ত গ্রন্থের বিরাট বড় ভূমিকা ছিল। অজ্ঞতা ও জ্ঞানের শত্রুতার

অন্ধকার যুগ বিলুপ্ত হওয়ার পর ইউরোপে জ্ঞানপ্রেমের এমন ঝোঁক জন্মায় যে, তারা সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার মূল্যায়নের এবং তা সংরক্ষণ করার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টাই চালায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা ও শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তির অধিকারী (Specialized) স্কলারস তৈরী করে। এমনকি বাস্তব ক্ষেত্রের সঙ্গে ঐ শাস্ত্রের কোন সম্পর্ক না থাকলেও। মুসলমানদের ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রসমূহের সংরক্ষণের পিছনে একটি কারণ তো ছিল এই, দ্বিতীয়তঃ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে জোরদার করার যারা ইচ্ছা পোষণ করত, তাদেরকে শক্তিশালী করার জন্য সে সমস্ত প্রাচ্যবিদরাই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় অস্ত্র যোগান দেয়, যারা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণায় আত্মনিবেদিত ছিল।

যাই হোক, যে কারণেই হোক না কেন প্রাচীন একাডেমিক উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ ইউরোপ খুব ভালভাবে করে। এমনকি যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ দেখার লোকও এখন সেখানে কদাচিতই দেখা যায়, বহু অর্থব্যয়ে অত্যন্ত যত্নসহকারে সেগুলোরও সংরক্ষণ করা হয়। সেগুলোকে কালের আবর্তন থেকে বাঁচানোর জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। ডাবলিনের লাইব্রেরীসমূহকে পার্লামেন্টের একটি এ্যাক্টের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছে। আলহামদুলিল্লাহ, এখন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে উন্নতমানের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে এ ব্যাপারে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্লভ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির কপিসমূহ আধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিনের মাধ্যমে আলমে ইসলামের বিভিন্ন দেশে যেমন সৌদী আরব, আরব আমিরাত, মিসর, তুরস্ক ও সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশ পাকিস্তান এ ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সারা দেশের কোথাও একটি লাইব্রেরীও সম্ভবতঃ এমন নেই, যা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। বরং আমাদের দেশের প্রত্যন্ত মফস্বল এলাকায় গ্রন্থসমূহের বড় দুর্লভ সংগ্রহ রয়েছে। সিন্ধুর পীরঝাণ্ডুর গ্রন্থাগার স্বীয় সমৃদ্ধির দিক থেকে বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ। এছাড়াও সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কিছু গ্রন্থাগার

অতুলনীয়। কিন্তু সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। এ সমস্ত গ্রন্থাগার প্রবীণ জ্ঞানবন্ধু ও বিদ্যানুরাগী গুণীজনেরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা নিজেদের সামর্থ্য মত সেগুলো সংরক্ষণও করে এসেছেন। কিন্তু গ্রন্থ সংরক্ষণের আধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিনারী তাঁদের নিকট নেই। আমি সেগুলোর কিছু গ্রন্থাগারে স্বচক্ষে দেখেছি যে, অনেক দুর্লভ গ্রন্থ উইপোকার আক্রমণ ও ঋতুর প্রতিকূল প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি বারবার এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কিন্তু ফলাফল তথৈবচ। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমানে আমাদের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী নিজেই একজন স্কলার। তাঁর জ্ঞান-বন্ধুত্ব সন্দেহাতীত। যদি তিনি সরকারকে একথা বুঝাতে সক্ষম হন যে, উন্নয়নশীল একটি দেশের জন্য এটিও অতীব জরুরী যে, তাকে নিজের লাইব্রেরীসমূহ সমৃদ্ধ ও সুসংহত করতে হবে, এজন্য উপকরণ যোগান দিতে হবে ; তাহলে হয়ত আমাদের দেশের এ সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার যুগের থাবা থেকে রক্ষা পাবে।

গ্রন্থাগারসমূহ দেখা শেষ হলে ডঃ শাহজাদ সাহেব ডাবলিন শহরটিও কিছুটা ঘুরে দেখান। শহরটি লিফেই (Liffey) নদীর উভয় দিকে অবস্থিত। শহরের মধ্যভাগও নদীর তীরেই অবস্থিত। ইউরোপের অন্যান্য শহরের ন্যায় ডাবলিনও একটি সুদৃশ্য শহর। কিন্তু এখানে রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায় প্রাচীন ঐতিহ্যসমূহের অনুবর্তিতায় তারা ইউরোপের অন্যান্য শহর থেকে অধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

আয়ারল্যাণ্ড ১৯২১ ঈসায়ী পর্যন্ত বৃটেনের অংশ ছিল। ১৯২১ ঈসায়ীর একটি এ্যাক্টের মাধ্যমে তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা অংশরূপে ছিল। অবশেষে ১৯৪৮ ঈসায়ীতে থেকেও তার শেষ সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে। ফলে সে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশের রূপ লাভ করে। আয়ারল্যাণ্ড মূলত বৃটেনের পশ্চিমের একটি দ্বীপ। উত্তর ও দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের সমন্বয়ে এই দ্বীপটি গঠিত। দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড বৃটেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপরোক্ত পন্থায় পৃথক দেশের রূপ লাভ করেছে। একে রিপাবলিক অব আয়ারল্যাণ্ড বলা হয়। ডাবলিন এর রাজধানী। কিন্তু উত্তর আয়ারল্যাণ্ড—যার বড় শহর বেলফাষ্ট—এখনও বৃটেনের অধীনে রয়েছে। সেখানে স্বাধীনতার আন্দোলন অব্যাহত

রয়েছে। এ কারণে বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে সংঘাতও হতে থাকে। তবে উভয় দেশ পরস্পরের যাত্রীদের যাতায়াতের এত সুবিধা দিয়েছে যে, তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে হয়। উভয় দেশের আকাশপথের ভ্রমণ, আভ্যন্তরীণ ভ্রমণের মত মনে হয়। এখানে ইমিগ্রেশন ও ভিসা ইত্যাদির ধাপ অতিক্রম করতে হয় না।

আয়ারল্যাণ্ডের নিজস্ব ভাষা 'আইরিশ'। তবে ইংরেজীও সমভাবে বলা হয়, বোঝা হয় ও লেখা হয়। দেশের অর্থনীতি বেশীর ভাগ নির্ভরশীল ছিল কৃষির উপর। এজন্যই তাকে কৃষকদের দেশ বলা হত। কিন্তু এখন শিল্পেও উন্নতি হয়েছে। পূর্বে এটি ইউরোপের তুলনামূলক পশ্চাদপদ দেশসমূহের মধ্যে গণ্য হত। কিন্তু এখন কিছুদিন ধরে সুসংহত অর্থনৈতিক পলিসির ফলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। দেশটি বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করছে। আইরিশ সমাজের উপর এখনও পর্যন্ত ধর্মের বন্ধন অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশের তুলনায় বেশী। অধিকাংশ অধিবাসী রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান। বৃটেনের প্রোটেস্টেন্ট অধিবাসীদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেও তাদের মতবিরোধ চলতে থাকে। এখানকার সমাজে ধর্মের অবস্থিতির ফলে এ দেশ নির্লজ্জতা ও নগ্নতার সেই প্লাবনে তুলনামূলক কম প্রভাবিত হয়েছে, যা সমগ্র পশ্চিমা জগতকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে।

আয়ারল্যাণ্ডে হাজার হাজার মুসলমান অধিবাসীও রয়েছে। তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক অধিবাসী পাকিস্তানী। যাদের অনেকে ব্যবসায়ী এবং অনেকে চাকুরীজীবি। পাকিস্তানী ডাক্তারদের এখানে বেশ কদর রয়েছে। তারা এখানে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। আরবদের সংখ্যাও অনেক। মাশাআল্লাহ বেশীর ভাগ মুসলমান এখানে সচ্ছল। তাদের সঙ্গে স্থানীয় লোকদের আচার-ব্যবহার মোটের উপর ভাল।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ছিল কনফারেন্সের সর্বশেষ কার্যকরী অধিবেশন। যা মাগরিবের পরও এশা পর্যন্ত চলতে থাকে। এশার পর—যা এখানে রাত সাড়ে দশটায় হচ্ছিল—এক বন্ধুর বাড়ীতে খাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। সেখান থেকে রাত বারোটায় হোটেলে ফিরি। জুমুআর দিন সকাল নয়টায় হোটেল থেকে রওয়ানা করি। বৃটিশ মিডল্যাণ্ডের

বিমানযোগে সাড়ে বারোটায় লণ্ডন পৌছি। বৃটেনের কিছু লোক মুসলিম জনসাধারণের জন্য ইসলামসম্মত পন্থায় পুঁজি বিনিয়োগের একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। শনিবার সকালে আমার তাতে অংশগ্রহণের প্রোগ্রাম ছিল। জুমুআর দিনের বিকালটি কয়েকদিনের বিরামহীন সফর ও ব্যস্ততার পর অবসর ছিল। ক্লান্তিতে দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ ছিল। টেম্‌স নদীর তীরে টাওয়ার ব্রীজ সংলগ্ন হোটেলে আমি অবস্থান করি। অদূরের একটি পাকিস্তানী রেস্তোরাঁয় মেজবানদের সঙ্গে খানা খেয়ে আমি হোটেলে এসে আরাম করি। আমার নিরিবিলি কয়েক ঘন্টা সময় প্রয়োজন ছিল। লণ্ডনের কোন বন্ধু আমার আগমনের ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। তাই নিরিবিলির এই কয়টি মুহূর্তে বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাজও করা সম্ভব হয়। রাতও নিরিবিলিতে কাটে। সকাল ৯টা থেকে বারোটা পর্যন্ত হোটেলেই মিটিং হয়। এটি ছিল সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ। পরদিন আমাকে ইসলামিক রিচার্স-এর অক্সফোর্ড সেন্টারে হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) সম্পর্কে একটি সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দুপুর বারোটায় অক্সফোর্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি।

অক্সফোর্ডে

অক্সফোর্ড লণ্ডন থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি ছোট একটি শহর। তবে তার ইউনিভার্সিটির কারণে বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ। এর শিক্ষার মান সারা বিশ্বে স্বীকৃত। এখানে ইসলামিক ষ্টাডিজের স্কলারশিপের জন্য একটি সেন্টার দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) এই সেন্টারের বোর্ড -এর সভাপতি ছিলেন এবং সৌদী আরবের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব জনাব আবদুল্লাহ উমর নাসীফ এর সহ-সভাপতি ছিলেন। হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)এর ইন্তেকালের পর বর্তমানে আবদুল্লাহ উমর নাসীফ সাহেবই এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানটি ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসান বালকিয়ার পক্ষ থেকে প্রতিবছর কোন ব্যক্তিত্বকে তার ইসলামী খেদমতের ভিত্তিতে পুরস্কারও প্রদান করে

থাকে। এই পুরস্কারের যোগ্য লোক নির্ধারণের জন্য বিচারকরূপে আমি ইতিপূর্বেও একবার এখানে এসেছি। সেন্টারের ডাইরেক্টর ফারহান নিযামী—যিনি ভারতের প্রসিদ্ধ লেখক জনাব খালিক আহমাদ নিজামীর পুত্র—আন্তরিক ভালবাসার কারণে আমাকে কয়েকবারই এখানে আসার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে কেবলমাত্র একবারই উপস্থিত হতে পেরেছি। এবার তিনি হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)এর স্মরণসভার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করেন। এতে অংশগ্রহণের আমি ওয়াদা করেছিলাম।

আমি দু'টার দিকে অক্সফোর্ড পৌছি। সন্ধ্যায় সেন্টারে অতিথিদের সম্মানে নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল। নৈশভোজের উদ্দেশ্যে বের হতে যাচ্ছি এমন সময় দারুল উলূম দেওবন্দ (ওয়াকফ)এর মুহতামিম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী সাহেবের ফোন আসে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত অপ্রত্যাশিত নেয়ামত মনে হল। নৈশভোজে গিয়ে দেখি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার বর্তমান মুহতামিম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে' নদভী সাহেব তাশরীফ এনেছেন। তিনি হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ সাহেব (কুঃ ছিঃ)এর ভাতিজা। হযরত মাওলানার যোগ্য উত্তরসূরীরূপে তাঁর মিশনের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে আরোপিত হয়েছে। 'আল বা'সুল ইসলামী'র সম্পাদক জনাব মাওলানা ওয়াযেহ রশীদ সাহেব নদভীও তাশরীফ এনেছেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হয়। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে' সাহেব এর সঙ্গে এটি আমার প্রথম সাক্ষাত। তাঁর পোশাক-আশাক ও অঙ্গভঙ্গি দেখে হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)এর স্মৃতি মানসপটে ভেসে ওঠে। সম্প্রতিই প্রায় একমাস পূর্বে ইংল্যাণ্ডের ডিউসভেবারী শহরে হযরত মাওলানা (রহঃ)এর আলোচনার উদ্দেশ্যে অধমের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ভারত, পাকিস্তান, ইউরোপ, আমেরিকা ও কুয়েত থেকে অনেকে অংশগ্রহণ করেন। সেই সমাবেশে আমি হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)এর চিন্তা ও কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাষণ দানের সুযোগ পাই। যা টেপ

রেকর্ডারের মাধ্যমে নকল হয়ে এখন পৃথকভাবে পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দেওয়া তাওফীকে সেই ভাষণে আমি অধম হযরত মাওলানার ইলম, আমল ও দাওয়াতী জীবন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করার প্রয়াস পাই। সে ভাষণে আমি তাঁর বিশেষ ভারসাম্যপূর্ণ রুচি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যাবলীও বর্ণনা করি। বৃটেনের বেশীর ভাগ আলেম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই ভাষণকে ব্যাপক সাধুবাদ জানানো হয়। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে আমার নিকট পত্র আসে যে, এটি দ্রুত প্রকাশিত হওয়া দরকার। মাওলানা ওয়াযেহ রশীদ সাহেব নদভী (দাঃ বাঃ) বললেন, মাওলানা সালমান নদভী সাহেবের মধ্যস্থতায়—যিনি ঐ সমাবেশে তাশরীফ নিয়েছিলেন—ঐ ভাষণের আলোচনা ভারতেও পৌছে এবং এটিকে হযরত মাওলানা (রহঃ)এর রুচি ও প্রকৃতির সঠিক ব্যাখ্যা আখ্যা দেওয়া হয়। আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা।

সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ডঃ আবদুল্লাহ উমর নাসীফ ছাড়াও আমার আরব বন্ধুদের মধ্যে কুয়েতের শায়েখ খালেদ আল মাজকুর, সিরিয়ার ডঃ আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ, ইরাকের ডঃ মুহীউদ্দীন কুররা দাগী এবং রাবেতাতুল আদাবুল ইসলামী, দামেস্ক-এর আবু সালেহও তাশরীফ এনেছিলেন। ডঃ আবদুল্লাহ উমর নাসীফের ইচ্ছায় একটি অধিবেশনের সভাপতিত্বও অধমের উপর ন্যস্ত করা হয়। শায়খ ইউসুফ আল কারজাভী 'সাফীরুল আজম ইলাল আরব' শিরোনামে তাঁর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি উপস্থিত হতে না পারায় আমার বন্ধু ডঃ মুহীউদ্দীন কুররা দাগী তা পাঠ করেন। শায়খ ইউসুফ আল কারজাভী সেই প্রবন্ধে হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)কে 'আরবদের সমীপে অনারবদের দূত' আখ্যা দেন। তিনি তাতে হযরত মাওলানার লেখনী, ভাষণ এবং ততোধিক তাঁর বাস্তব জীবন আরব বিশ্বের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা তুলে ধরেন। শায়খ কারজাভী যে ভাষায় হযরত মাওলানাকে ভক্তিমাল্য পেশ করেন, তা নিশ্চয়ই অসাধারণ। আরবের বিশিষ্ট এক ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে হযরত মাওলানার উচ্চাসনের এই স্বীকৃতি উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য নিঃসন্দেহে

অতি বড় গর্বের বিষয়। মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী সাহেব (মুঃ যিঃ)এর 'মুশকিলাতুন ওয়ালা আবা হাসানা লাহা' শিরোনামের প্রবন্ধটি বড় চমৎকার ছিল। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী (মুঃ যিঃ) তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু সর্বাঙ্গীন ভাষণে হযরত মাওলানার সার্বিক চিন্তা-চেতনার উপর আলোকপাত করেন। ডঃ আবু সালেহ রাবেতাতুল আদাবিল ইসলামীর মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্যের উপর হযরত মাওলানার কর্মের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তাঁর বিভিন্ন সেবা ও কর্মের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উচ্ছসিত হয়ে কেঁদে ফেলেন। আল্লামা খালেদ মাহমুদ সাহেবও তাঁর বিশেষ আঙ্গিকে ভাষণ দান করেন। ফলে উপস্থিতির ধন্যবাদ ধ্বনিতে হলকক্ষ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

অধিকাংশ ভাষণ হয় আরবীতে। আর কিছু হয় উর্দূতে। ডঃ ফারহান নিযামী সাহেব আমাকে উভয় ভাষায় ভাষণ দানের জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর সে অনুরোধ আমাকে রক্ষা করতে হয়। ভাষণদানকারীদের সংখ্যা অধিক হওয়ায় এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ ছিল না। তবে আমি সংক্ষেপে হযরত মাওলানার দাওয়াতী জীবনের ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করি, যা আমার ক্ষুদ্র মতে তাঁর দাওয়াতের মধ্যে অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টির কারণ ছিল এবং যেগুলোর কারণে তাঁর বক্তব্য বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। একে আমার ডিউসবেরীর ভাষণের সারাংশ বলাই যথার্থ। ইনশাআল্লাহ তা সত্বরই ছেপে বের হবে। তাতে দ্বীনের কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম রয়েছে।

কিছু আরব কবি হযরত মাওলানা সম্পর্কে স্তুতি-কাব্য রচনা করেছিলেন। সেগুলোও আবৃত্তি করে শোনানো হয়। সেগুলো আরব সুধীজনকে এক অপূর্ব ভাব-বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন করে।

এবার আমি এই একটিমাত্র দিনের জন্যই বৃটেন এসেছিলাম। অবিলম্বে আমাকে করাচী পৌছতে হবে বিধায় অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু যে কয়জন ব্যক্তিই অধমের অক্সফোর্ড আসার ব্যাপারে অবগত হতে পেরেছিলেন, তারা সবাই দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে অক্সফোর্ড চলে আসেন। মাওলানা ইবরাহীম রাজা, যিনি দারুল উলূম বার্নীর যোগ্য ওস্তাদদের অন্যতম এবং অধ্যয়ন ও গবেষণার বিশেষ

রুচির অধিকারী, তিনি আমাকে এত ভালবাসেন ও করুণা করেন যে, আমি বৃটেনের আশেপাশে যেখানেই থাকি না কেন, তিনি দীর্ঘ পথ সফর করে সেখানেই চলে আসেন। এবারেও তিনি ব্লাকবার্ন থেকে চার ঘন্টার পথ অতিক্রম করে শনিবারেই এখানে চলে এসেছিলেন। পরের দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গেই থাকেন। আমার অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বন্ধু মাওলানা মুহাম্মাদ দীদাত সাহেব—যিনি দারুল উলূম বার্নীর লাইব্রেরী-প্রধান—বহু বছর ধরে আমার সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক ভালবাসার সম্পর্ক। তিনি গ্রন্থ বিষয়ে বিশেষ রুচির অধিকারী। আমাকে ভালবাসেন বিধায় আমার নিকট সময় সময় নতুন নতুন গ্রন্থ এবং হস্তলিপি কপির ফটোকপি পাঠিয়ে থাকেন। তিনি মাওলানা ইবরাহীমের মাধ্যমে হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব (মেশকাতুল মাসাবিহের মূল গ্রন্থ) 'আল মাসাবিহের' আল্লামা তুরপুশ্তী (রহঃ)-এর উৎকৃষ্টতম ভাষ্যগ্রন্থের হস্তলিপি কপি আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। যা এখনও কোথাও মুদ্রিত হয়নি। এটি ছিল আমার জন্য একটি বিশাল নেয়ামত।

ইসলামিক ইয়থ ফোরামের প্রধান জনাব মাওলানা সালীম ধৌরাত সাহেব—যিনি মাশাআল্লাহ এখানকার তরুণদের মধ্যে অতি উচ্চমূল্যের শিক্ষা প্রদান করছেন এবং দাওয়াত ও সামাজিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন—লেস্টার থেকে সফর করে এখানে তাশরীফ আনেন এবং আমার ভাষণে অংশগ্রহণ ও সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের পর অবিলম্বে ফিরে যান। মুফতী রিয়াজুল হক সাহেব বার্মিংহামের ইসলামী সেন্টারের প্রধান। তিনি সিম্পোজিয়াম সমাপ্ত হওয়ার পর এসে পৌছান। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাত হয়। ডিউসবারীর মাওলানা ইয়াকুব ইসমাঈল মুনশী সাহেব, যিনি বৃটেনের প্রসিদ্ধ আলেমদের অন্যতম এবং অনেক গবেষণা মূলক কাজ করে থাকেন, তিনিও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের জন্য তাশরীফ এনেছিলেন, তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়।

অক্সফোর্ড অতি ছোট একটি শহর। সেখানে তিনটি মসজিদ রয়েছে। তার মধ্যে মদীনা মসজিদ হচ্ছে সবচে' বড়। সেখানে শিশুদের দ্বীনী শিক্ষার জন্য মাদরাসা এবং ইসলামী সেন্টারও রয়েছে। এই সেন্টারের প্রধান মাওলানা মুহাম্মাদ জামিল সাহেব সখখরের (পাকিস্তান) অধিবাসী

এবং মাদরাসায়ে আশরাফিয়া সখখর থেকে শিক্ষা সমাপনকারী আলেম। তিনি বহুদিন ধরে এখানে সেবাদান করে যাচ্ছেন। সিম্পোজিয়ামে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অল্পসময়ের জন্য তাঁর মসজিদ পরিদর্শনে যেতে অনুরোধ করেন। সুতরাং আসর নামায আমি সেখানে পড়ি। উপস্থিত সুধীজনের অনুরোধে সংক্ষিপ্ত ভাষণও দান করি। সেন্টারের ধর্মীয় তৎপরতা দেখে বড় আনন্দিত হই। ফেরার পথে মাওলানা জামিল সাহেব অক্সফোর্ড শহর ঘুরে দেখান।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রথমে একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে আরম্ভ হয়েছিল। তবে ক্রমে ক্রমে তাতে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর পর এটি প্রকৃত অর্থেই উন্নতি আরম্ভ করে। এমনকি তা বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই ইউনিভার্সিটি এদিক থেকে ব্যতিক্রমধর্মী যে, এর নিজস্ব কোন ভবন বা ক্যাম্পাস নেই। তার বদলে এখানে প্রচুর কলেজ রয়েছে। এ সমস্ত কলেজ ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সংযুক্ত। কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদেরকে ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে ডিগ্রী দান করা হয়। অতি ছোট এই শহরটিতে প্রায় চল্লিশটি কলেজ রয়েছে। যেগুলোতে সমগ্র বিশ্বের ছাত্ররা শিক্ষালাভ করছে। এর মধ্যে অধিকাংশ কলেজ কয়েক শ' বছরের প্রাচীন। এগুলোর ভবনসমূহও প্রাচীন। এগুলোকে তার প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ ধাঁচে অব্যাহত রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এমনকি ভবনের বহিঃপ্রাচীরসমূহে কালের আবর্তনে যে কালিমা পড়েছে, তা দূর করে রং-পালিশের ব্যবস্থাও করা হয়নি। পুরাতন কাঠের ভগ্নফটক ওভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

পার্শ্ববর্তী গলিসমূহে শত শত বছর পূর্বে পাথরের সড়ক থেকে থাকলে এখনও তা পাথরেরই রেখে দেওয়া হয়েছে। যে যে কলেজে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বগণ শিক্ষালাভ করেছেন, সেগুলোর কতক স্থানে তাদের স্মৃতিচিহ্নও রয়েছে।

বোডলিয়ান লাইব্রেরী (Bodlian Library) আক্সফোর্ডের সেই প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী, যেখানে আরব ও প্রাচ্যের হস্তলিপিগ্রন্থের বহু সংগ্রহ রয়েছে। মারিশ লাইব্রেরীর আলোচনা করতে গিয়ে আমি লিখেছি যে, আর্চ বিশপ

মারিশ তার সংগৃহীত হস্তলিপি গ্রন্থসমূহ অক্সফোর্ডের এই লাইব্রেরীকেই দিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল আর দিনটি ছিল রবিবার তাই লাইব্রেরীর ভিতরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বাহির থেকে শুধু ভবন দেখে ফিরে আসি। এ অঞ্চলেরই একটি জায়গাকে এদিক থেকে স্মরণীয় মনে করা হয় যে, বৃটেনে সর্বপ্রথম কার তৈরীকারী ব্যক্তি মারিশ এই জায়গাতেই কারটি বানিয়েছিলেন। সেই কারের ছবিও এখানে লাগানো রয়েছে। পরবর্তীতে মারিশের নামে বহুদিন পর্যন্ত এই কার বানানো হয়। এখন তা Rover 'রোভার' নামে তৈরী হচ্ছে।

পরদিন সকাল নয়টায় মাওলানা জামিল সাহেবের সঙ্গে লণ্ডন হিথ্রো বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বৃটিশ এয়ারওয়েজে সাত ঘন্টা ওড়ার পর দুবাই অবতরণ করি। বিমানে ওড়ার এ সময়টি এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখার কাজে ব্যয় করি। এ লাইন কয়টি এখানে লাউঞ্জে বসে শেষ করছি। রাত একটা বেজে চলছে। বিমান যাত্রা করবে বিধায় বিমানে আরোহণের জন্য আহবান করা হচ্ছে। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এ ভ্রমণ বৃত্তান্তও সমাপ্ত হল।

অক্টোবর ২০০০ ঈসায়ী।

ইয়ামানের সান'আ নগরীতে

ইয়ামানের রাজধানী 'সান'আ' নগরীর নাম আমি সর্বপ্রথম আমার দশ বছর বয়সে দারুল উলূম করাচীতে 'মাকামাতে হারীরী' নামক প্রসিদ্ধ আরবী–সাহিত্য–গ্রন্থ পাঠ করার কালে শ্রবণ করি। গ্রন্থটির প্রত্যেকটি 'মাকামা'কে কোন একটি নগরীর সাথে সম্পৃক্ত করে নামকরণ করা হয়েছে। তার প্রথম 'মাকামা'র নাম 'সান'আনিয়্যাহ'। তাতে 'সান'আ' নগরীর একটি আলেখ্য বিবৃত হয়েছে। পরবর্তীতে হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে এ নগরীর গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারলেও কখনও তা দেখার সুযোগ হয়নি। আরব দ্বীপের প্রত্যেকটি দেশে আমার বারবার যাওয়া হলেও ঘটনাচক্রে ইয়ামানের এ ভূখণ্ডে কখনো যাওয়ার সুযোগ হয়নি। একবারমাত্র নাইরোবী যাওয়ার পথে 'সান'আ' বিমানবন্দরে বিমান যাত্রা বিরতি করেছিল। কিন্তু তখনও শহরাভ্যন্তরে যাওয়া হয়নি।

এ বছর (১৪২২ হিজরী) সফর মাসে আমি সান'আ নগরীর 'জামেআতুল ঈমান'এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শায়েখ আবদুল মাজীদ জিন্দানী (হাফিযাহুল্লাহ)এর পক্ষ থেকে এ মর্মে একটি দাওয়াতপত্র পাই যে, তিনি ২রা মে, ২০০১ সালে তদীয় প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপনকারীদের ১ম ব্যাচের সম্মানার্থে সান'আ নগরীতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছেন। তিনি সেই সম্মেলনে আমার অংশগ্রহণের প্রত্যাশী। ঘটনাচক্রে সেই তারিখেই কায়রোতেও সেখানকার ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হতে যাচ্ছিল। তাতে অংশগ্রহণের জন্য তাদের পক্ষ থেকে আমার উপর জোর পীড়াপীড়ি চলছিল। কিন্তু বেশ কয়েকটি কারণে আমি কায়রোর পরিবর্তে সান'আয় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এ সিদ্ধান্তের একটি কারণ এও ছিল যে, কায়রোতে বারবার যেয়ে থাকি, কিন্তু

ইয়ামান যাওয়ার বাসনা এখনও অপূর্ণই রয়ে গেছে।

ইয়ামানের ভূখণ্ড নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরা কিংবা নগরায়নের দিক থেকে দর্শনীয় বিধায় আমার এ আগ্রহ ছিল তা নয়। আমার এ আগ্রহের মূল কারণ ছিল, আল্লাহ তাআলা এ দেশটিকে এমন এক বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন, যা পবিত্র মক্কা–মদীনার পর অন্য কোন দেশের ভাগ্যে জোটেনি। হাদীস শরীফে ইয়ামান ও ইয়ামানের অধিবাসীদের বিষয়ে অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ ভূখণ্ড আম্বিয়া কেরাম, সাহাবা, তাবেঈন ও বুযুর্গানে দ্বীনের ভূখণ্ড ছিল। একজন মুসলমানের জন্য আকর্ষণের অনেক উপাদানই এ ভূখণ্ডে রয়েছে। কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে এ ভূখণ্ড সম্পর্কে যে সমস্ত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সংকলন করা হলে পূর্ণ একটি গ্রন্থ তৈরী হবে। তাই তার বিশেষ কিছু ফযীলত নিম্নে প্রদত্ত হল।

হাদীস শরীফে আছে যে, যখন ইয়ামানের প্রতিনিধিদল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আসে, তখন তিনি বলেন—

اتاكم اهل اليمن هم ارق افئدة والين قلوبا ، الايمان يمان والحكمة يمانية

অর্থ ঃ 'তোমাদের নিকট ইয়ামানের লোক এসেছে, তাদের মন বড় কোমল এবং তাদের হৃদয় বড় বিনম্র। ঈমান ইয়ামানের এবং হিকমাত ইয়ামানের।' (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৪১২৭)

অন্য এক রেওয়ায়াতে এই শব্দ এসেছে—

الفقه يمان والحكمة يمانية

অর্থ ঃ 'ফেকাহ ইয়ামানের এবং হিকমাত ইয়ামানের'।

(সহীহ বুখারী, হাদীস–৪১২৯)

অপর একসময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন—

الايمان ههنا

অর্থ ঃ 'ঈমান এদিকে রয়েছে।' (সহীহ বুখারী, মাগাযী, হাদীস–৪১২৭)

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের দিকে তাকালেন এবং এই দু'আ করলেন—

اللهم اقبل بقلوبهم

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! তাদের অন্তরসমূহকে (ঈমানের দিকে) আকৃষ্ট করুন।' (তিরমিযী শরীফ, মানাকের, হাদীস–৩৯৩০)

হযরত জুবায়ের বিন মুতয়িম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল আসমানের দিকে উত্তোলন করে বলেন—

اتاكم اهل اليمن كقطع السحاب خير اهل الارض

অর্থ ঃ 'তোমাদের নিকট ইয়ামানের লোকেরা মেঘখণ্ডের ন্যায় আসছে। তারা সমগ্র পৃথিবীবাসীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের চেয়েও কি?' তিনি বললেন, 'তোমাদের ছাড়া।' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

হযরত আমর বিন আবাছা (রাযিঃ) বলেন যে, একবার উয়াইনা বিন হাসান ফাযারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে নজদবাসীকে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক আখ্যা দিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

كذبت، بل خير الرجال اهل اليمن، والايمان يمان، وانا يمان

অর্থ ঃ 'তুমি ভুল বলেছো, বরং সর্বশ্রেষ্ঠ লোক ইয়ামানের লোক এবং ঈমান ইয়ামানের এবং আমিও ইয়ামানের।' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে যে ইয়ামানের দিকে সম্পৃক্ত করলেন তার কারণ এই হতে পারে যে, 'ইয়ামান' ছিল মূলতঃ আরবদের পূর্বপুরুষ 'কাহতানের' পুত্রের নাম। তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)এর সন্তানদের অন্যতম। এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ–সম্পর্ক ইয়ামানীদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, ইয়ামানের লোকদের নীতি–অভ্যাস

যেহেতু আমার পছন্দনীয় তাই আমিও যেন ইয়ামানের। মোটকথা, কারণ যাই হোক না কেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজেকে ইয়ামানের লোকদের দিকে সম্পৃক্ত করা এত বড় এক মর্যাদা যে, এ নিয়ে যত গর্বই করা হোক না কেন তা কমই হবে। অপর একটি হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই এরশাদ বর্ণিত হয়েছে—

الايمان يمان و هم منى والى، و ان بعد منهم المربع ويوشك ان
ياتوكم انصارا و اعوانا فامركم بهم خيرا

অর্থ ঃ 'ঈমান ইয়ামানের এবং তারা (অর্থাৎ ইয়ামানের অধিবাসীরা) আমার থেকে এবং আমার দিকে, চাই তারা যত দূরেই অবস্থান করুক না কেন এবং সেই সময় অদূরে, যখন তারা (ইসলাম ও মুসলমানদের) সাহায্যকারীরূপে আবির্ভূত হবে। আমি তোমাদেরকে তাদের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছি।' (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এছাড়া একটি হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানবাসীর এ বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছেন যে, মোসাফাহা পদ্ধতির সর্বপ্রথম প্রচলন ঘটায় তারা।' (আবু দাউদ শরীফ)

যে মুসলমান এ সমস্ত হাদীসের মাধ্যমে ইয়ামান ও ইয়ামানবাসীর এ সমস্ত ফযীলত জানতে পারবে, তার নিঃসন্দেহে এ দেশ ও এর অধিবাসীদের দেখার বাসনা জাগবে, যদিও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের লোকদের এ সমস্ত ফযীলত সে যুগের হিসাবে বলেছিলেন। এবং এটি জরুরী নয় যে, চৌদ্দশ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের মধ্যে এ সমস্ত গুণাবলী অবশিষ্ট থাকবে। তবুও প্রথমতঃ

بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است

অর্থ ঃ 'বুলবুলের জন্য ফুলের সঙ্গের অন্তঃমিলই যথেষ্ট।'

দ্বিতীয়তঃ, আল্লাহ তাআলার নিয়ম এমনই যে, যখন কোন ভূখণ্ডের লোকদের মধ্যে কিছু গুণ ও যোগ্যতা দেন, তখন কালাবর্তে তার বাস্তব প্রয়োগ যতই ব্যাহত হোক না কেন, কিন্তু স্বভাবগত যোগ্যতার কিছু না কিছু নিদর্শন তার পরও রয়ে যায়।

যাই হোক, এ সমস্ত কারণে ইয়ামানকে এক নজর দেখার বাসনা আমি দীর্ঘদিন ধরে অন্তরে পোষণ করে আসছিলাম। 'আল–ঈমান' বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই নিমন্ত্রণ আমাকে সে বাসনা পূরণের সুযোগ করে দেয়। তাই অবিলম্বে আমি তা গ্রহণ করি।

৭ই রবিউল আউয়াল ১৪২২ হিজরী মোতাবেক ১লা জুন ২০০১ ঈসায়ী সকাল ৮টায় পি.আই.এ. এর বিমানযোগে আমি দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। সান'আর বিমানে আরোহণের প্রতীক্ষায় এখানে আমাকে সাড়ে চার ঘন্টা সময় অপেক্ষা করতে হয়। তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের সংশোধনের বেশীর ভাগ কাজ আমি বিমানেই করেছি। আল্লাহর মেহেরবানীতে এভাবেই তার পাঁচ ভলিউমের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এখন আমার সঙ্গে ৬ষ্ঠ ভলিউমের সূরা 'ত্ব–হার' অংশ ছিল। এর পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছেন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা জনাব ইশরাত হুসাইন সিদ্দীকি সাহেব। দুবাইয়ে অপেক্ষার এ সময় আমি তার সংশোধনে ব্যয় করি। আজ ছিল জুম'আ বার। জুমআর নামায পড়ার জন্য বিমানবন্দরের বাইরে যাওয়ার ভিসা আমার নিকট ছিল না। বেলা একটার সময় আমি দুবাই বিমানবন্দরের নির্ধারিত নামাযের জায়গায় চলে যাই। সেখানে এ পরিমাণ লোক উপস্থিত ছিল যে, তাদের নিয়ে জুমআর নামায হতে পারে। [১]

সুতরাং উপস্থিত সবাই জুমআর নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং আমাকে নামায পড়ানোর কথা বলে। এক ব্যক্তি আযান দেয়। আমি খুৎবা দিয়ে নামায পড়াই। এভাবে বিমানবন্দরে জুমআর নামায পড়ানোর প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

বেলা দুইটায় ইয়ামান এয়ারলাইন্সের বিমান দুবাই থেকে রওয়ানা হয়। বিমান প্রথমে বাহরাইন যায় তারপর সেখান থেকে সান'আর

১. হানাফীদের মতে জুমআর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য 'ইযনে আম' তথা 'সাধারণ অনুমতির' যে শর্তটি রয়েছে, তার সঠিক অর্থ এই যে, যে বৃহৎ অঞ্চলে জুমআর নামায পড়া হচ্ছে, সেখানকার লোকদের উপর জুমআর নামাযে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা না থাকতে হবে। নিরাপত্তা প্রভৃতির কারণে বড় কোন এলাকার মধ্যে বাইরের লোকের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকলে তাতে জুমআ শুদ্ধ হওয়ার উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বাহরাইন থেকে সানআর পথ তিন ঘন্টায় অতিক্রম করে। এর বেশীর ভাগ সময়ও আমি মাআরিফুল কুরআনের কাজে ব্যয় করি। বিকাল ছয়টা বাজছিল। বিমান সান'আর বিমানবন্দরে অবতরণ করল। সেখানকার সিঁড়ির উপরেই 'জামেয়াতুল ঈমানের' সভাপতি শায়েখ আবদুল মাজিদ জিন্দানী, প্রধান পরিচালক শায়েখ আবদুল ওহাব ও আরো অন্যান্য অনেকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। ভি.আই.পি লাউঞ্জে আমাদের থেকে পাসপোর্ট ও সামানাপত্রের টিকিট নিয়ে কোনরূপ অপেক্ষা ছাড়া আমাদেরকে হোটেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হোটেলে গিয়ে আমরা মাগরিব নামায আদায় করি। হোটেলটির নাম 'ফিন্দাক সান'আ আদ্‌দুয়ালী।' সম্প্রতিই হোটেলটি নির্মিত হয়েছে। জামেয়াতুল ঈমানের অতিথিদের দ্বারাই এখানে অতিথিদের অবস্থান সূচিত হয়।

করাচী থেকে সরাসরি কোন বিমান সান'আর উদ্দেশ্যে এলে খুব জোর তিন/সাড়ে তিন ঘন্টায় এখানে পৌঁছা সম্ভব ছিল। কিন্তু ঘোরাপথে ভ্রমণের ফলে এখানে পৌঁছতে আমাকে বার ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়। জামেয়াতুল ঈমানের জনৈক প্রফেসর শায়েখ আদেল হাসান আমীন আমার গ্রন্থাদির মাধ্যমে আমার সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌর নদওয়াতুল উলামায় হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)এর বিশিষ্ট সাগরেদ ছিলেন। তিনি আমার রওনা হওয়ার পূর্বেই করাচীতে বারবার আমাকে ফোন করছিলেন। তিনি আমার আরবী কিতাবসমূহ সঙ্গে আনার জন্য ফরমায়েশ করেছিলেন। তিনি বিমানবন্দর থেকে অনবরত আমার সঙ্গে ছিলেন। দুবাই থেকে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (রহঃ)এর সুযোগ্য নাতি ডঃ সালমান সাহেবও একই বিমানযোগে সান'আ পৌছেন। তাঁর সঙ্গে শায়েখ আদেলের বহুদিনের হৃদ্যতা ও অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিল। ডঃ সালমান সাহেবের ছেলে ইউসুফ সাহেব জামেয়াতুল ঈমানেই শিক্ষারত রয়েছেন। হোটেলে পৌঁছার পর আমার কক্ষ অনেকক্ষণ পর্যন্ত এঁদের উপস্থিতিতে আলোকোজ্জ্বল থাকে। রাতের খাবারও সবাই এখানেই খায়। এগারোটার দিকে সবাই নিজ নিজ বিছানায় চলে যায়।

আমার কক্ষটি (যা একটি বেডরুম, ড্রয়িং রুম ও ডাইনিং রুম বিশিষ্ট ছিল) পঞ্চম তলায় ছিল। কক্ষের খিড়কি দিয়ে পাহাড়সারির পাদদেশে সান'আ নগরীর বিস্তৃত জনপদ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। করাচী ও দুবাইতে গ্রীষ্ম তার যৌবনে অবস্থান করছিল। কিন্তু সান'আর ঋতু ছিল বড় মনোরম। খিড়কি গলিয়ে আসা শীতল বায়ু সারা দিনের ক্লান্তি সত্ত্বেও দেহে সজীবতা ও পুলক জাগিয়ে তুলছিল। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উঁচু হওয়ার কারণে মে–জুনেও এখানকার তাপমাত্রা ছাব্বিশ থেকে ত্রিশ ডিগ্রীর মধ্যে বিরাজ করছিল। মানুষ ছায়ায় অবস্থান করলে এখানে মোটেও গরমের কষ্ট অনুভব করে না। হোটেলে যদিও এয়ার কণ্ডিশান বা পাখা ছিল না, কিন্তু জানালা খোলার পর কৃত্রিম শৈত্যের কোন প্রয়োজনই অনুভূত হয়নি।

ভোর চারটায় এখানে সুবহে সাদিক হচ্ছিল। তাই ফজরের পর আরও কিছু সময় ঘুমানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। সকাল সাড়ে ৬টায় পুনরায় ঘুম থেকে জেগে অভ্যাসমাফিক প্রাতঃভ্রমণে বের হই। সান'আর সর্ববৃহৎ মহাসড়ক 'শারে' সিত্তীন' হোটেলের সম্মুখ দিয়েই চলে গেছে। মহাসড়কের প্রান্ত ধরে দ্রুত পায়ে আধাঘন্টা পথ চলে আমার প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাসটি পুরা করি। হোটেলে ফিরে এসে নাস্তা শেষ করতেই আমার মেজবান জামেআর সমাবেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ী নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। জামেয়াতুল ঈমান এখান থেকে আনুমানিক দশ মিনিটের পথ। আমরা যখন জামেয়ার গেটে পৌঁছি, তখন জনসাধারণের ভীড়ের ফলে গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করা দুষ্কর হয়ে যায়।

জামেয়াতুল ঈমান

'জামেয়াতুল ঈমান' আরব দেশসমূহের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী গুরুত্বের অধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়। উপমহাদেশের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যায় প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারণা এখন আরব দেশসমূহে অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাদ দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষাদানের উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান এসব দেশে পাওয়া যায় না। তবে

জামেয়াতুল ঈমান আমার জানামতে আরব দেশসমূহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় না হওয়া সত্ত্বেও এত বৃহৎ পরিসরে ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জামেয়ার মহাপরিচালক শায়েখ আবদুল মাজীদ বিন আবদুল আজীজ যিন্দানী ইয়ামানের প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী আলেমদের অন্যতম। আফগান জিহাদের সূত্রে তিনি দীর্ঘদিন পাকিস্তানেও অবস্থান করেন। পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতার উপর তাঁর বিশেষ গবেষণা অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এক সময় তিনি ইয়ামানের পার্লামেন্টে পার্টির লীডার ছিলেন। প্রেসিডেন্টের পর প্রোটোকলের দিক থেকে সারাদেশের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় অবস্থানে। কিন্তু তিনি স্বীয় বিদ্যানুরাগের কারণে উক্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আজ থেকে সাত বছর পূর্বে জামেয়াতুল ঈমান প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে তিনি শিক্ষাদান কাজেই ব্যাপৃত রয়েছেন।

জামেয়াতুল ঈমানে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী কিছু বিষয় বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি এই জামেয়াকে নিছক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এটিকে আমল ও দাওয়াতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও বানানোর প্রয়াস চালান। সুতরাং এখানে ছাত্রদের ভর্তির নিয়মও সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ব্যতিক্রম। এখানে 'সানুবিয়ার' পর থেকে শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। যে সমস্ত ছাত্র ভর্তির একাডেমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাদেরকে ভর্তি করার পূর্বে ৪০ দিনের এক বাস্তবকর্ম ভিত্তিক পরীক্ষা কাল অতিক্রম করতে হয়। এ ৪০ দিন সময়ে তাদেরকে ওয়াজের মজলিসে অংশ নিতে হয়। জামাআতে নামায পড়ার বাধ্যবাধকতার সাথে সাথে তাদেরকে প্রতি রাতে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তে হয়। সপ্তাহে দু'দিন রোযা রাখতে হয়। প্রতিদিন যত্নসহকারে শারিরীক ব্যায়াম করতে হয়। ন্যূনতম পক্ষে একবার একঘন্টার বিরামহীন দৌড়ে অংশ নিতে হয়। উপরোক্ত সমস্ত বিষয়ে প্রত্যেক ভর্তিচ্ছুক তালিবে ইলমের জন্য নম্বর রয়েছে। যে সমস্ত ছাত্র এই চল্লিশদিন সময়ে কাঙ্খিত নম্বর লাভ করে কেবলমাত্র তাদেরকেই ভর্তির যোগ্য মনে করা হয়। তাই দেড় হাজার ছাত্র

ভর্তির জন্য দরখাস্ত করলে তার মধ্যে হাজার বারো শ' ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। উত্তীর্ণ হওয়ার পর উপরোক্ত নিয়মসমূহ বাধ্যবাধকতাপূর্ণ না হয়ে উৎসাহব্যাঞ্জক বিষয়ে পরিণত হয়। তবে শিক্ষা চলাকালীন বছরসমূহে দু' মাসের জন্য সমস্ত ছাত্রকে দেশের মফস্বল ও দূরবর্তী পাহাড়ী এলাকাসমূহে দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। এই দাওয়াতী ভ্রমণ পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত নয়। বরং এটিও পাঠ্যক্রমের অংশবিশেষ। যার মাধ্যমে ছাত্ররা জনসাধারণের সঙ্গে একীভুত হয়ে তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে অবহিত করার কাজ করে থাকে। বার্ষিক ছুটি পয়লা রমাযান থেকে ১০ই শাওয়াল পর্যন্ত এবং ঈদুল আযহার সময় দু' সপ্তার জন্য ছুটি হয়ে থাকে।

জামেয়ার পাঠ্যক্রম ৭ বছরের। তার প্রথম তিন বছর সমস্ত ছাত্রের জন্য একই রকম। তার মধ্যে তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ, উসূলে হাদীস, উসূলে ফেকাহ ও আরবী সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষাদান করা হয়। কুরআন হিফজ করা প্রত্যেক ছাত্রের জন্য আবশ্যকীয়। পরবর্তী চার বছরের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। তাতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহের উচ্চতর শিক্ষাদান ছাড়া বিভিন্ন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদানও করা হয়। ছাত্রীদের শিক্ষাদানের জন্য পর্দাসহ পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। যে সমস্ত সন্তানধারিণী নারী দ্বীনী ইলম লাভ করতে ইচ্ছুক, তাদের সন্তানদের দেখাশোনার জন্যও একটি শাখা রয়েছে। সেখানে শিক্ষালাভকালীন সময় তাদের সন্তানদের পরিচর্যা করা হয়। ছাত্রীদের পক্ষ থেকে 'আশ্ শাকাইক' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। শিক্ষাদান ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা বিনামূল্যে। বর্তমানে জামেয়াতে পাঁচ হাজার ছাত্র শিক্ষাধীন রয়েছে। তারা ইয়ামানের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে এখানে শিক্ষালাভের জন্য এসেছে। তার মধ্যে সৌদী আরব, উপসাগরীয় দেশসমূহ ও বিভিন্ন আফ্রিকান দেশসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন ছাত্র পাকিস্তানের, আর একজন হিন্দুস্তানেরও রয়েছে। 'জামেয়াতুল ঈমান' এদিক থেকে উপমহাদেশের বড় বড় মাদরাসার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যে, এটি একটি প্রাইভেট শিক্ষাকেন্দ্র এবং এখানে শিক্ষাদান ও থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যয়ভার জামেয়া নিজে বহন করে থাকে। জনসাধারণের চাঁদা ছাড়া

এর নির্দিষ্ট কোন আমদানীর পথও নেই। কিন্তু পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যব্যবস্থার দিক থেকে এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

এ বছর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম ব্যাচ সাত বছরের পাঠ্যক্রম সমাপন করছে। এ পর্যায়ে জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা শায়েখ আবদুল মাজীদ যিন্দানী একটি আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত করা সমীচীন মনে করেন। আজকের এই মহাসমাবেশ সে উদ্দেশ্যেই ছিল।

উপমহাদেশের মত এ ধরনের সাধারণ সভা-সমাবেশের ধারণা বেশীর ভাগ আরব দেশে পাওয়া যায় না। তবে জামেয়াতুল ঈমানের এই সভায় জনসাধারণের এত বড় সমাবেশ এবং তাদের আবেগ-উদ্যম উপমহাদেশের ধর্মীয় জলসার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। সমাবেশ হচ্ছিল মসজিদের সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত হলকক্ষে। কিন্তু হলকক্ষের চতুর্দিকে প্রচুর শ্রোতা খোলা আকাশের নীচে রোদে দাঁড়িয়ে ভাষণ শুনছিলেন।

ষ্টেজের প্রথম সারিতে বিশেষ মেহমানদের জন্য বহুদূর পর্যন্ত সোফাসেট পাতা ছিল। সেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী ইয়ামানের ভাইস প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্টের স্পিকার এবং বিভিন্ন মন্ত্রীবর্গ ছাড়াও সৌদী আরব, কুয়েত, মিসর, জর্দান, সিরিয়া, আমিরাত, সুদান, কাতার, পাকিস্তান ও ভারতের আলেমগণকে উপবেশন করানো হয়েছিল। এ সমস্ত দেশের আলেমদের মধ্যে শায়েখ ইউসুফ আল কার্জাভী, শায়েখ খলীফা জাসিম, শায়েখ আবদুর রাজ্জাক আসসিদ্দীক, ডঃ ইয়াসীন গজবান ও শায়েখ খালেদ হিন্দাভীর নাম এখন আমার স্মরণ আছে। পাকিস্তান থেকে আমি ছাড়া শ্রদ্ধেয় ভাই জনাব মাওলানা সামীউল হক সাহেব এবং জামায়াতে ইসলামীর আমির জনাব কাজী হুসাইন আহমাদ সাহেবও নিমন্ত্রিত হন। তাঁদের সঙ্গে সেখানে সাক্ষাত হয়। ভারত থেকে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)এর নাতি ডঃ সালমান নদভী সাহেবও তাশরীফ আনেন।

সাড়ে নয়টার সময় পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসা আরম্ভ হয়। তারপর জামেয়াতুল ঈমানের ব্যবস্থাপক ও ছাত্রদের ভাষণ হয়। তাতে জামেয়ার পরিচিতি ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। ইয়ামানের কতিপয় প্রখ্যাত আলেম ও বক্তা তাঁদের বক্তব্যে ভাষালংকারের চমক দেখান। সত্যিই ভাষণ-শিল্পের দিক থেকে এ

ভাষণগুলো ছিল বড় উঁচুমানের। এক ভদ্রলোক আরবীতে সুদীর্ঘ ও উঁচুমানের কবিতা পেশ করেন। উপস্থিতি এ সমস্ত ভাষণ ও কাব্যের প্রশংসায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনে হাততালি না দিয়ে বরং 'আল্লাহু আকবার' ও 'ওয়ালিল্লাহিল হামদ' (আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা)এর গগনবিদারী শ্লোগান দিচ্ছিলেন।

বহির্দেশীয় মেহমানদের মধ্য থেকে দু' ব্যক্তিকে ভাষণদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। একজন শায়েখ ইউসুফ আল কারজাভী আর দ্বিতীয়জন এই লেখককে। শায়েখ ইউসুফ আল কারজাভী জামেয়ার সূচনা থেকেই তার পাঠ্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়নে শামিল ছিলেন। তাই তিনি তাঁর ভাষণে জামেয়ার বৈশিষ্ট্যাবলী ও তার আবশ্যকতার উপর জোর দেন। সাথে সাথে ঐ শ্রেণীর লোকদের জোরালো প্রতিবাদ করেন, যারা ধর্মনিরপেক্ষতার আবেগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদানকে অনর্থক মনে করে এবং এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বদনাম রটানোর কোন সুযোগকে হাতছাড়া করে না।

শায়েখ কারজাভীর পর আমাকে ভাষণ দানের জন্য আহবান করা হয়। আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠের পর আমি নিবেদন করি যে, আজ এই প্রথমবার ইয়ামান এসে আমার দীর্ঘদিনের লালিত একটি মনোবাসনা পূর্ণ হল। ইয়ামান দেখার এবং ইয়ামানবাসীদের সঙ্গে নিকটে বসে সাক্ষাত করার বাসনা আমার পর্যটন ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং এর মূল কারণ হলো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামান ও ইয়ামানবাসীদের ঈমান ও হিকমতের পদক দানে ভূষিত করেছেন। তাই বিশ্বের অপরাপর লোক তাদের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, উন্নত শিল্পকলা ও জাঁকজমকপূর্ণ নগর ব্যবস্থার উপর গর্ব করুক, কিন্তু হে ইয়ামানবাসী! আপনাদের গর্বের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত এ আলোকদীপ্ত পদকই যথেষ্ট। এর চেয়ে বড় গর্বের আর কোন বস্তু হতে পারে না। কিন্তু এ মর্যাদা যত বড় গর্বের, তার দাবীও ততই নাজুক এবং তার দায়িত্বও ততই বৃহৎ। কাজেই ইয়ামানের জনসাধারণ, উলামা ও শাসকদের উপর এ দায়িত্ব বর্তায় যে, তাঁরা ঈমান ও হিকমাতকে প্রাচ্য ও

প্রতিচ্যে বিস্তার করার কাজে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করবেন। বিশ্ববাসীর সম্মুখে ঈমান ও হিকমাতের অপরূপ বাস্তব প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে ইসলামের ঐ সমস্ত দুশমনের মুখ বন্ধ করবেন, যারা ইসলামকে বিকৃতরূপে তুলে ধরে থাকে।

আমি নিবেদন করি যে, ইয়ামানের সঙ্গে ঈমানের অলংকার যেভাবে গ্রন্থিত রয়েছে, তার দাবীও এই যে, এখানে জামেয়াতুল ঈমানের ন্যায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেখানে ঈমান ও হিকমতের মূর্তপ্রতীক তৈরী করা হবে।

এই ভূমিকার পর আমি সংক্ষেপে ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করি, যেগুলোর প্রতি জামেয়া ও এখান থেকে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত।

শায়েখ আবদুল মাজীদ যিন্দানী—যিনি কার্পেটে স্থান সংকুলান না হওয়ায় নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে সাধারণ বিছানায় উপবিষ্ট ছিলেন—ষ্টেজে এসে জামেয়ায় তাঁর সাত বছরের পরিশ্রমের ফলাফল এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা বর্ণনা করেন। সর্বশেষ ভাষণ দান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী ইয়ামানের ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি তাঁর লিখিত ভাষণটি জনসাধারণের বাচন-ভঙ্গীতে পেশ করেন। তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বের স্বীকৃতিদানের সাথে সাথে সরকারের পক্ষ থেকে এর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার ঘোষণা করেন।

ভাষণদান শেষে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। শায়েখ আবদুল মাজীদ সনদপত্রের নাম 'শাহাদাত' বা 'ডিগ্রী' ইত্যাদি না দিয়ে নামকরণ করেছেন 'ইজাযাত'। তাঁর বক্তব্য হল, ডিগ্রী আধুনিক কালের আবিষ্কার। পূর্বকালীন মহান বুযুর্গগণ ছাত্রদেরকে ডিগ্রী নয় বরং এজাযত তথা অনুমতিদান করতেন। তাই তিনিও এ সমস্ত সনদের নাম 'ইজাযত' রাখেন। সর্বোপরি এই সমাবেশের সর্বাধিক হৃদয় বিগলিতকারী দৃশ্য ছিল সেটি, যেটি শায়েখ আবদুল মাজীদ যিন্দানী শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের নিকট থেকে অঙ্গিকার গ্রহণকালে অবতারিত হয়। শিক্ষাসমাপনকারী শতাধিক ছাত্রের সকলে দেহে নীলবর্ণের সুদৃশ্য 'কাবা' এবং মস্তকে ছোট সুদৃশ্য পাগড়ী আচ্ছাদিত ছিলেন। অঙ্গিকার

গ্রহণকালে তাঁরা সকলে একসারিতে দাঁড়িয়ে যান। এটি বড় আবেগ উদ্দীপক ও প্রভাবশালী একটি অঙ্গিকারপত্র ছিল, যা শায়েখ আবদুল মাজীদ পাঠ করছিলেন আর শিক্ষাসমাপনকারী ছাত্ররা তা পুনরাবৃত্তি করছিলেন। এভাবে ছাত্রদের থেকে অঙ্গিকার গ্রহণ করা হয় যে, যে ইলম তাঁরা এতদিন শিখেছে, যতদূর সম্ভব তা তাঁরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তা অন্যদের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন। যখন ছাত্ররা এই অঙ্গিকার করছিলেন, তখন তাঁদের কারো কারো চক্ষু অশ্রুসিক্ত ছিল।

একটার দিকে মনোহরী এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। জনসাধারণের প্রচুর ভীড় হেতু বাইরে বের হয়ে গাড়ী পর্যন্ত পৌঁছা দুস্কর হয়ে পড়ে। প্রত্যেকে বহিঃর্দেশীয় মেহমানদের সঙ্গে মোসাফাহা করার ফিকিরে ছিল। তাদের মুখমণ্ডলে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের দ্বীপ্তি সুস্পষ্ট পাঠ করা যাচ্ছিল।

ইয়ামানের পার্লামেন্টের চেয়ারম্যান শায়েখ আবদুল্লাহ আল আহমার স্বগৃহে বহিঃর্দেশীয় মেহমানদের সম্মানে আজ দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। তাঁর বাসস্থানটি সানআ নগরীর মধ্যবর্তী এলাকায় একটি প্রাচীন ধাঁচের সুপ্রশস্ত হাবেলী ধরনের। বহিঃর্দেশীয় মেহমানগণ ছাড়াও ইয়ামান সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং নগরীর সম্মানিত লোক নিমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করেন।

অতিথিদের আতিথেয়তায় ইয়ামানের জাতীয় ঐতিহ্যসমূহ পরিপূর্ণ পরিস্ফুটিত ছিল। উপস্থিত সকলে ইয়ামানের জাতীয় পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত ছিলেন। যার অবশ্যম্ভাবী অংশরূপে ছিল সেই খঞ্জর, যা তাদের কোমরবন্ধনীতে ঝুলানো থাকে। এই খঞ্জরকে স্থানীয় ভাষায় 'জাম্বিয়া' বলা হয়। কারণ এটি এখানকার প্রত্যেকের কটিদেশে ঝোলানো থাকে। গোত্রীয় জীবনে এ হাতিয়ারটি সবাই নিজের সঙ্গে রাখত। বর্তমানে এর ব্যবহার শহুরে জীবনে পরিত্যক্ত হলেও তা ইয়ামানবাসীদের পোশাকের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এতে নিত্যনতুন কারুকার্য করা হয়। এক ভদ্রলোক বললেন, আমাদের নিমন্ত্রণকারী শায়খ আবদুল্লাহ আল আহমারের খঞ্জরটি এক লক্ষ

ইয়ামানী রিয়াল থেকে অধিক মূল্যবান। পোশাকের এই আঙ্গিক সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ইয়ামান ছাড়া ওমানেও গোচরীভূত হয়। তবে ওমানও মূলত প্রাচীন ইয়ামানেরই একটি অংশ ছিল। আহারের জন্য বসার ব্যবস্থা ছিল মেঝেয়। বড় একটি হলকক্ষের গালিচার উপর দস্তরখান বিছানো হয়েছিল। খাদ্যের আয়োজন ছিল পুরোটাই ইয়ামানী। ইয়ামানবাসীর মধ্যে ছাগল ও দুম্বার গোশত রান্না করার বহু বিচিত্র প্রকারের পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। সেসবের মধ্য থেকে অধিকাংশ প্রকারেরই আয়োজন করা হয়েছিল। আর বাস্তবিকই প্রত্যেক প্রকারের স্বাদও ছিল ভিন্নরকম। সাধারণতঃ আমরা যখন স্বদেশী খাবারে অভ্যস্ত হয়ে যাই, তখন ভিনদেশী কোন খাবার সুস্বাদু মনে হয় না। কিন্তু এই নিমন্ত্রণের সমস্ত খাবারই আমাদের রুচির দিক থেকেও বড় উন্নতমানের ছিল। ঘটনাচক্রে আমাদের নিমন্ত্রণকারী শায়খ আবদুল্লাহ আল আহমার আমার নিকটেই বসেছিলেন। তিনি তাঁর ঐতিহ্যবাহী আতিথেয়তার লক্ষ্যে পরিণত করেন আমাকে ও মাওলানা সামিউল হক সাহেবকে। আমাদের প্লেট তিনি বারবার পূর্ণ করছিলেন। বাধা দিলেও মানছিলেন না। সবশেষে বড় একটি থালাতে পরোটা সদৃশ একটি খাদ্যবস্তু আনা হয়। এটি ছিল ঘি দ্বারা তৈরী অনেক বড় একটি রুটি, যা সুবিস্তৃত থালায় বিস্তীর্ণ ছিল। তার উপর দিয়ে মধু গড়িয়ে পড়ছিল। শায়খ আহমার বললেন, এটি ইয়ামানের বিশেষ রুটি। একে 'বিন্তুস্ সহান' (থালকন্যা) বলা হয়। এটি ইয়ামানবাসীর অতি প্রিয় খাবার, যা বিশেষ বিশেষ দাওয়াতের ক্ষেত্রে তৈরী করা হয়। এর উপর যে মধু গড়িয়ে পড়ছিল তা খাঁটি মধু। যা ইয়ামানের বিশেষ উপঢৌকন।

যাই হোক, আমরা আসরের সময় উপভোগ্য এই নিমন্ত্রণ শেষ করে হোটেলে ফিরে আসি।

সন্‌আ নগরী

কিছু সময় হোটেলে বিশ্রাম করার পর মাগরিবের কিছু পূর্বে আমরা আমাদের পথপ্রদর্শক শায়খ হাসান আদেল আমীনের সঙ্গে সন্‌আ নগরীর কিছু স্মরণীয় স্থান দেখার জন্য বের হই। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মাওলানা সামীউল